চাঁদমামা
মে ১৯৭৩
৭০ P
http://mayajaal.blogspot.com

যেমনি সোজা তেমনি মজা! শুধু পরপর সাজানো উপরের নম্বরগুলোকে দাগ টেনে জুড়ে দাও। দেখবে তুমি জোকারের একটা মজাদার ছবি এঁকে ফেলেছ। ছবি শেষ করেই চটপট ১২টি চিক্‌লেট্‌স-এর একটি খালি প্যাক আর নীচের কুপনটির সাথে ছবিটি এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। ঠিকানা ইংরেজিতে লেখ।

Chiclets product officer, CB
Post Box 9116, Bombay-25

কেবল ১৫ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েরাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে।

প্রথম ১০০ টি প্রবেশপত্রের (প্রতিটি ভাষায় ১০টি) মধ্যে প্রতিটি প্রবেশপত্রের জন্য পাওয়া যাবে ৪টি কমিক কিম্বা 'ওয়ার্লড ১০০' ভিন্ন ভিন্ন ডাকটিকিট।

এখন থেকে চিক্‌লেট্‌স পাওয়া যাবে ছ'টি মুখরোচক সরস স্বাদেঃ পিপারমিণ্ট, অরেঞ্জ, টুটি-ফ্রুটি, লেমন, পাইনঅ্যাপেল ও চকোলেট।

(তোমার নাম ঠিকানা ইংরজীতে লিখে পাঠাবে)

আমার নাম ....

ঠিকানা ....

....

আমি চাই ৪টি কমিক কিম্বা 'ওয়ার্লড ১০০' ভিন্ন ভিন্ন ডাকটিকিট (যেটি তোমার চাই তাতে টিক চিহ্ন লাগাও)

চিক্‌লেট্‌স—মজার চুইং গাম ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' আর ক্যালসিয়ামে ভরা
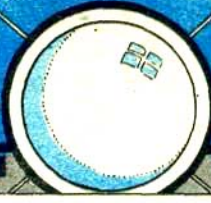
চাঁদমামা
সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি
এবারের বেতাল কথা 'গরিবের দম্ভে' প্রকাশ পেয়েছে প্রতিজ্ঞা পালন করতে গিয়ে কিভাবে যে একজন মৃত্যুর পথে এগিয়ে গেল তারই মর্মান্তিক কাহিনী।
রাজা নির্বাচনে 'পট্ট হাতী' কেন যে রবিবর্মার গলায় মালা পরিয়ে দিল তা স্বয়ং তার মাহুতও বুঝতে পারল না। এক 'কিপটে ব্যবসাদারের' ছেলে জাদুর সাহায্যে পণ না নিয়ে মনের মত মেয়েকে বিয়ে করল। 'দলিল' কাহিনীটি বহুদিন পাঠকের মনে থাকবে। এ ছাড়া আরও মজার কাহিনী আছে।
খণ্ড ১ মে ১৯৭৩ সংখ্যা ১১
CHITRA

স্বজনো ন যাতি বৈরম্
পরহিতনিরতো বিনাশকালেপি,
ছেদেপি চন্দন তরুঃ
সুরভয়তি মুখম্ কুঠারস্য। ॥ ১ ॥

[সৎপুরুষ যেমন সব সময় অপরের মঙ্গল কামনা করেন এমন কি নিজের বিনাশ মুহূর্তেও শত্রুতার ভাব পোষণ করেন না তেমনি চন্দনগাছ, যে কুড়াল তাকে কাটে তাকেও সুগন্ধ দান করে।]

বিসৃজ্য শূর্প ব দ্দোষান
গুনান্ গৃহ্নন্তি সাধবঃ ;
দোষা নেব তু গৃহ্নন্তি
চালিনী বতু দুর্জনাঃ। ॥ ২ ॥

[কুলো যেমন ভূষি উড়িয়ে সার গ্রহণ করে তেমনি সজ্জন ব্যক্তি দোষ ত্যাগ করে ভালকে গ্রহণ করেন। আবার চালুনি ভূষি ধরে রেখে সার বস্তু ত্যাগ করে তেমনি দুর্জন ব্যক্তি শুধু দোষগুলোকেই গ্রহণ করে।]

খলঃ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি,
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি। ॥ ৩ ॥

[খারাপ লোক অপরের সরিষার সমান খুঁতও দেখতে পায় আর নিজের কদ্‌বেলের মত দোষও দেখতে পায় না।]

সজ্জন-দুর্জন
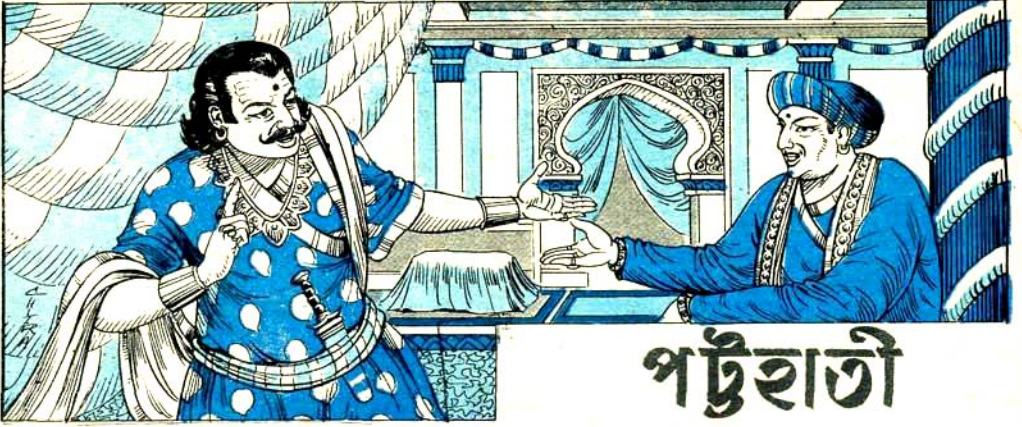
পট্টহাতী

হাজার বছর আগেকার কথা। শরণ দেশে অশোকবর্মা নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। প্রত্যেক বছর তিনি যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতেন। এই প্রদর্শনী থেকেই নিপুণ যোদ্ধাদের বাছাই করা হত। তাদের চাকরি দেওয়া হত রাজ দরবারে। এই ভাবে যাদের নিয়োগ করা হত তাদের মধ্যে একজন ছিল রবিবর্মা।

রাজা অশোকবর্মার কোন সন্তান ছিল না। হঠাৎ তার মৃত্যু হয়। তিনি বলে যেতে পারেন নি তাঁর পরে রাজা কাকে করা উচিত। তাঁর দরবারে রাজা হওয়ার যোগ্য অনেকে ছিল। কিন্তু মন্ত্রী সুমন্ত ওদের মধ্যে কাউকে সিংহাসনে বসাতে ভয় পাচ্ছিলেন। কারণ ওদের মধ্য থেকে একজনকে রাজা করা হলে অন্যেরা তাঁর শত্রু হয়ে যাবে।

অগত্যা মন্ত্রী এ ব্যাপারে রাজগুরুর পরামর্শ চাইলেন। রাজগুরু বললেন, "মন্ত্রীবর, এই সমস্যা সমাধান করার বিষয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। এ দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে রাজা নির্বাচন করবে পট্ট হাতী। এই রীতি প্রাচীন কালে ছিল এই দেশে। সেই রীতি অনুসরণ করাই হবে আমাদের কর্তব্য।

মন্ত্রী ভাবলেন, সেই ভাল। পট্ট হাতী রাজা নির্বাচন করলে কারও কিছু বলার থাকবে না। তিনি নির্বাচনের দিন ক্ষ· ঠিক করার ভার রাজগুরুকে দিলেন। রাজগুরু পনের দিন পরের একটি দিন ঠিক করলেন। মন্ত্রী ঢাক পিটিয়ে নির্বাচনের

শিবরাম চক্রবর্তী

দিন ক্ষণ দেশবাসীকে জানিয়ে দিলেন। ঐ দিন পট্ট হাতী যার গলায় ফুলের মালা পরাবে সেই হবে শরণ দেশের রাজা।

মন্ত্রীর ঘোষণা শুনে কেউ খুশী হল আবার কেউ নিরাশ হল। বাকিদের মনে আশার আলো জ্বলতে লাগল।

নিরাশ হয়েছিলেন রবিবর্মা। রাজা অশোকবর্মার তিনি ছিলেন বিশ্বাসী পাত্র। দরবারের কেউ সে কথা জানত না। রাজা সমস্ত গোপন বিষয় রবিবর্মাকে বলতেন। সমস্ত গোপন ব্যাপার জেনেও এমন সাধারণ ভাবে থাকতেন যেন কেউ তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত না হন। রাজা অশোকবর্মাও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন তাঁর পর রবিবর্মাকেই রাজা করতে বলে যাবেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটায় কোন কথাই বলে যেতে পারেন নি। তাই ঘোষণার পর রবিবর্মার মনে হল পট্ট হাতী জানবে কি করে কে রাজা হওয়ার উপযুক্ত। যার তার গলায় মালা পরিয়ে দেবে। আর তাকেই রাজা হিসেবে বরণ করে নিতে হবে।

পট্ট হাতীকে যে দেখাশোনা করে সেই মাহুতেরই ইচ্ছে জাগল রাজা হওয়ার। মনে মনে ঠিক করল হাতীকে ভাল করে শেখাতে হবে যাতে ঐদিন ঠিক তার গলাতেই মালা পরায়। এখনও পনের দিন বাকি আছে। এই পনের দিন ধরে শেখালে হাতী ঠিক তার গলাতেই মালা পরাবে ঐদিন। পট্ট

হাতীশালার পাশেই একটি মহল ছিল। ঐ মহলের চারপাশে ছিল এক উদ্যান। মাহুত দেয়াল টপকে উদ্যানে ঢুকে ফুল তুলে এনে মালা গাঁথল। হাতীর শুঁড়ে ধরিয়ে সেই মালা তার গলায় পরানো অভ্যাস করাল।

হাতীশালার পাশের মহলটি ছিল রবি-বর্মার। তিনি ঐ ফুল সাজানোর কাজে ব্যবহার করতেন। রবিবর্মা লক্ষ্য করলেন যে উদ্যানের ফুল কেউ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এক-দিন রাত্রে তিনি নিজেই উদ্যান পাহারা দেন।

মধ্যরাত্রে মাহুত যথারীতি দেয়াল টপকে উদ্যানে ঢুকে ফুল তুলে নিয়ে যায়। রবিবর্মা তার পিছনে পিছনে গিয়ে দেখলেন মাহুত ঐ ফুল দিয়ে মালা গেঁথে সেই মালা হাতীর শুঁড়ে দিয়ে তাকে দিয়ে নিজের গলায় পরাতে যাচ্ছে। দরজার দিকে পিছন ফিরে মাহুত মালা পরতে যাচ্ছিল। তাই দরজায় যে রবিবর্মা ছিলেন মাহুত তা বুঝতে পারে নি। হাতী মালা নিয়ে আওয়াজ করে দরজার কাছে দাঁড়ানো রবিবর্মার দিকে শুঁড় বাড়াল। মুহূর্তে রবিবর্মা সেখান থেকে সরে গেলেন। মাহুতের মনে হল কেউ তার এই কাণ্ড দেখে ফেলেছে। তারপর থেকে মাহুত মালা পরানোর অভ্যাসও আর ঐ পট্ট হাতীকে করায় নি।

রাজা নির্বাচনের দিনে পট্ট হাতীর শুঁড়ে ফুলের মালা পরিয়ে মাহুত রাজপ্রাসাদে এল। কোন এক অছিলায় মাহুত হাতীর
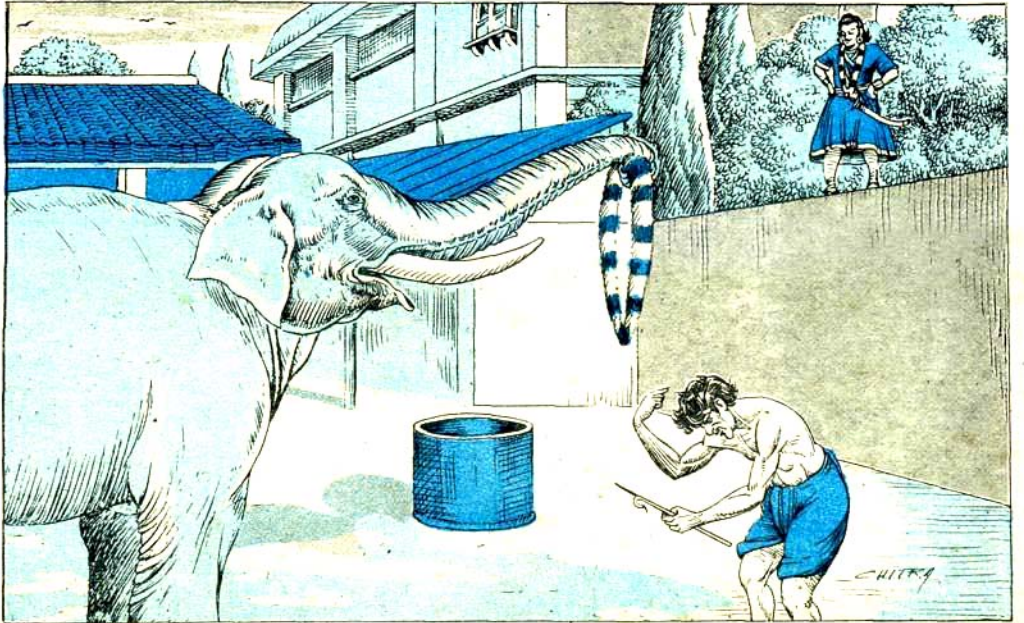
সামনে একবার দাঁড়াল। কিন্তু পট্ট হাতী তার গলায় মালা পরাল না। হাতীকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে কারো অপেক্ষায় আছে। কত লোক যায় আসে কিন্তু হাতী এমন ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যেন তার কিছু করার ছিল না। অনেকক্ষণ পরে রবিবর্মাক দেখে হাতী আওয়াজ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিল। তারপর নিয়ম অনুসারে রবিবর্মার রাজ্যাভিষেক হল।

কিছুদিন পরে ঐ মাহুত রবিবর্মাকে একান্তে বলল, "মহারাজ, অভয় দিলে আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি।"

"কি প্রশ্ন করতে চাও, কর।" রবিবর্মা বললেন।

"মহারাজ, আমি পট্ট হাতীকে আমার গলায় মালা পরানো অনেক দিন শিখিয়ে ছিলাম কিন্তু রাজা বাছাইয়ের দিনে হাতী আমার গলায় মালা না দিয়ে আপনার গলায় মালা পরাল কেন।" মাহুত বলল।

এ কথায় রবিবর্মা হেসে জবাব দিলেন, "তুমি পট্ট হাতীকে অনেক বিদ্যাই তো শিখিয়েছ। কিন্তু তার একটিও তোমার নিজের ক্ষেত্রে খাটাবার জন্য নয়। হাতীকে তুমি যখন মালা পরানো শেখালে তখন তার মাথায় একথা ঢোকেনি যে ওকে তোমার গলাতেই মালা পরাতে হবে। এক দিন রাত্রে হাতী তোমার গলায় মালা পরাতে গিয়ে আমাকে দেখেছিল। আমার গলায় সব সময় মালা থাকে। আমার গলায় মালা দেখে হাতীর মাথায় ঢুকেছে আমার গলায় মালা পরানোই তার উচিত। আর তাই সে শুড় দিয়ে মালাটা আমার দিকে এগিয়ে দিতে লাগল। আমি ঝট করে সরে গেলাম। আর সেই রাত্রেই আমি তোমার খারাপ মতলব টের পেলাম। আমার ধারণা সেই রাত থেকেই হাতীর মগজে ঢুকে ছিল আমার গলায় মালা পরানোর চিন্তা।"
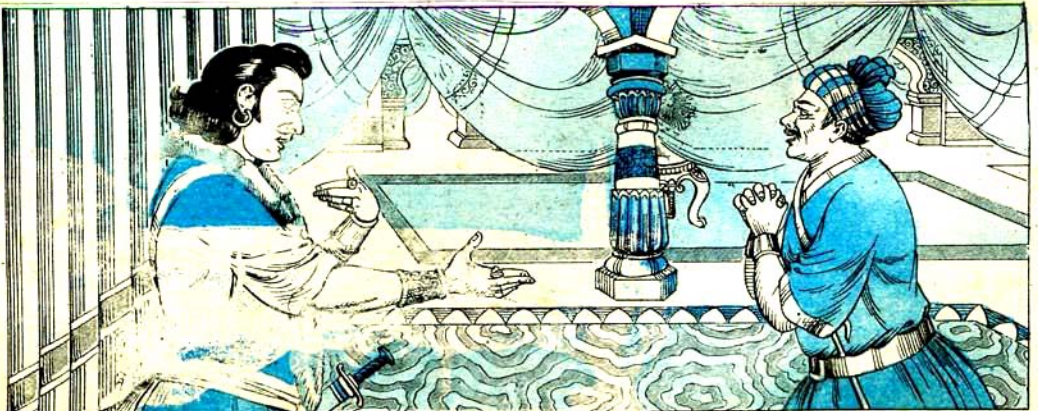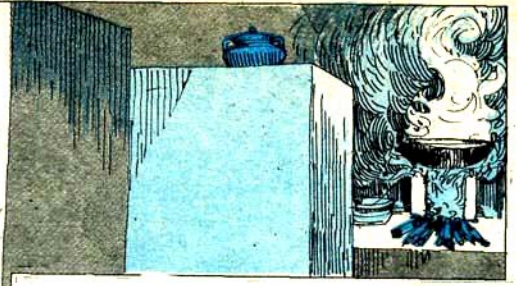
অন্ধকারে অতিথি

ইরাকের এক শহরে মহম্মদ ও জরীনা নামে এক গরিব দম্পতি ছিল। জরীনা গর্ভবতী ছিল। তার হালুয়া খাওয়ার ইচ্ছা জাগল।

মহম্মদের ভাগ্যে শুকনো ভাত রুটিই জোটে না। তার উপর সুজি পাবে কোথা থেকে। জরীনার ইচ্ছা পূরণ করবে কি করে! একে বউটার বয়স কম, তায় গর্ভ-বতী। এই সময় মুখে রুচি থাকে না। সামান্য একটু হালুয়া খেতে চেয়েছে। কোন দিন কিছু মুখ ফুটে বলে না। তাই মহম্মদ ঠিক করল যে কোন ভাবে বউকে সে হালুয়া খাওয়াবে।

আগের দিন বৃষ্টি হয়েছিল। তাই, ব্যবসাদাররা ভেজা জিনিস রোদে দিয়েছিল। এক জায়গায় সুজি রোদে দেওয়া ছিল। তা দেখেই মহম্মদ তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে গায়ে তেল মেখে ঐ জায়গায় চলে এল। হাঁটতে হাঁটতে সে ঐ সুজির উপর পড়ে গড়াতে গড়াতে সারা গায়ে সুজি মেখে হাবা গোবার মত উঠে বাড়ি ফিরল। সুজিটা চেঁচে একটা কুলোতে রেখে স্নান করে নিল।

এবার সে মাথায় পাগড়ি বেঁধে তেলের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই যে দাদা, তেল কত করে?" কথা বলতে বলতে তেল দেখার নাম করে তেলের টিনে ঝুঁকে তেল দেখার অভিনয় করল। পাগড়ি তেলের টিনে পড়ে গেল। পাগড়িটা তুলে নিয়ে দোকানদারের কাছে ক্ষমা চেয়ে বাড়ি ফিরল। পাগড়ি নিঙড়ে যে তেল বেরুলো সেই তেল একটা পাত্রে রাখল। তেল আর সুজি তো জুটলো আর চাই কাঠ ও গুড়।

বহিমিয়ার লোককথা

মহম্মদ আবার বেরুলো। গুড়ের দোকানে গিয়ে বলল, "হুজুর আমার এক গাড়ী গুড় কিনবেন। আপনার কাছে সব চেয়ে ভাল যে গুড় আছে তার একটু নমুনা আমাকে দিন তো। নমুনা হিসেবে অতটা গুড় যে পাবে তা ভাবতে পারেনি সে। তার থেকে কিছুটা বিক্রি করে সেই পয়সা দিয়ে কাঠ কিনল।

হালুয়া তৈরি হতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এল। ওরা আলো ধরানোর চেষ্টা করল না। কোন দিন যাদের ঘরে আলো ধরে না তার ঘরে হঠাৎ আলো দেখলে লোকে সন্দেহ করবে। তাই তারা সেই অন্ধকারেই হালুয়া খেতে বসলো। এক পাত্রেই হালুয়া রেখে দুজনে দুদিকে বসল। হালুয়া মুখে তুলতে যাবে এমন সময় আবুল নামে এক আত্মীয় দূর থেকে এল।

আবুল দেখল অন্ধকার হলেও লোক আছে বাড়িতে। সে পা টিপে টিপে ওদের পিছনে বসে হাত বাড়িয়ে হালুয়া তুলে খেতে লাগল। সে খাচ্ছে আর বেশ মজা পাচ্ছে। ওর হাতের সঙ্গে মহম্মদ ও জরীনার হাত লাগছিল। কিন্তু দুজনের কেউই ভাবতে পারেনি যে ওটা তৃতীয় কোন লোকের হাত। হালুয়া তাড়াতাড়ি সাবার হয়ে গেল।

"এত তাড়াতাড়ি হালুয়া ফুরিয়ে গেল কি করে? আমি তো সামান্য একটু খেয়েছি।" জরীনা বলল।

"আমিও তো খুব কম খেয়েছি। তোমার জন্যই সব রেখে দিয়েছি।" মহম্মদ বলল।

"তোমাদের সঙ্গে আমিও তো খেয়েছি।" আবুল বলে উঠল। তারপর বাতি জ্বালিয়ে আবুলকে ওরা দেখতে পেল।

বউকে যে কত কাণ্ড করে হালুয়া খাওয়াতে পেরেছে তা শুনে আবুলের মনে ওদের প্রতি কেমন যেন মায়া হল। সে মহম্মদের হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে সুজি গুড় তেল কাঠ কিনে আনতে অনুরোধ করল।

যক্ষপর্বত

দশ

[খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত বৃদ্ধ পূজারীকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করে শিথিল ভবন থেকে বেরিয়ে পড়ল। বেরুনোর পথে পূজারিণীর সাথে তাদের দেখা হল। খড়্গবর্মা তার উপর তীর চালাল। তারা তান্ত্রিক ও লোমশ-ভূতের সাথে বনে পৌঁছাল। সেখানে তারা পাহাড় থেকে একটা উটের পড়া দেখল। তার পর···]

একটি উট পাহাড় থেকে গড়াতে গড়াতে পড়ছে। এই দৃশ্য খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত দেখতে পেল। উঁচু থেকে পড়ার ফলে উটের পা ভেঙ্গে গেল। পা ভেঙ্গে উট মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। আর তার সঙ্গে যে লোকটা পড়ল তারও হাঁটুতে খুব চোট লেগে ছিল। সে হাঁটুর উপর দুই হাত দিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে কষ্ট সহ্য করার চেষ্টা করছিল। তার চোখে মুখে যন্ত্রণার করুণ ছাপ। লোকটার পোশাক দেখে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত অনুমান করল যে লোকটা নিশ্চয় লুণ্ঠন-কারীদের দলের।

জীবদত্ত ঐ লুণ্ঠনকারীর কাছে গিয়ে বলল, "ওহে লুণ্ঠনকারী, তোমার দেখছি কঠিন প্রাণ। তোমার সাথে যে উট ছিল
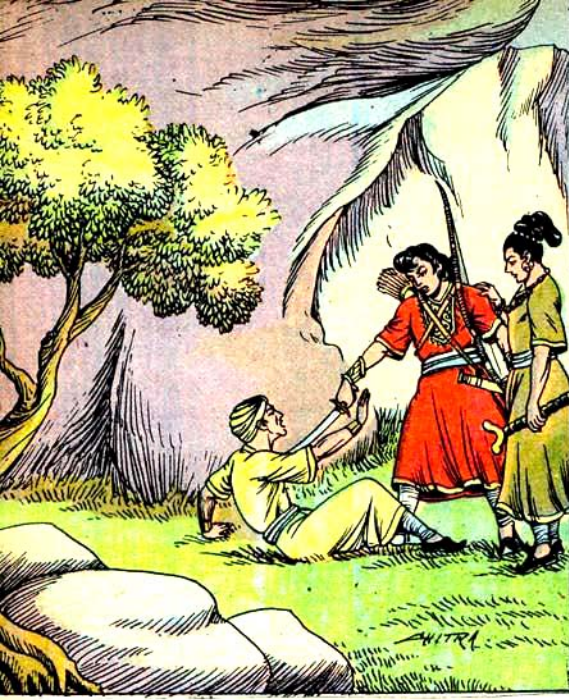
তার পা ভেঙ্গে গেল, সে উট মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে আর তোমার কিছুই হল না।”

এতক্ষণ লুণ্ঠনকারী নিজের আঘাতের জন্যে দাঁতে দাঁত চেপে কষ্ট পাচ্ছিল। চোখে অন্ধকার দেখছিল সে। জীবদত্ত ও খড়্গবর্মা যে তার কাছে আসছে তা সে লক্ষ্য করেনি। জীবদত্তের গলার স্বর কানে যেতেই সে মাথা তুলে অবাক হয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, “হুজুর, আমাকে মারবেন না। গণ্ডকজাতির ক্ষেতের ফসল লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে আমি ছিলাম না। আমার কথায় বিশ্বাস না হলে স্বর্ণাচারিকে জিজ্ঞেস করে সত্য ঘটনা জেনে নিতে পারেন।”

তার কথা শুনে খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের বিস্ময়ের সীমা রইল না। ওরা বুঝল যে স্বর্ণাচারি জীবিত এবং লুণ্ঠনকারীরা তাকে এখনও সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে।

খড়্গবর্মা তৎক্ষণাৎ খাপ থেকে তরবারি বের করে আহত লুণ্ঠনকারীর বুকে ধরে বলল, “এখন যা যা জিজ্ঞেস করব ঠিক ঠিক জবাব দাও। তা না হলে এই উট যেমন শেয়ালের খাবার হবে, তোমাকেও তাই হতে হবে। তুমি হয়ত লুণ্ঠনকারীদের সাথে গণ্ডক জাতের ক্ষেতের ফসল লুণ্ঠন করনি। কিন্তু আমাদের দেখেই তুমি বুঝলে কি করে যে আমরা গণ্ডক জাতের লোককে সাহায্য করতে এসেছি।”

জীবদত্ত খড়্গবর্মাকে তরবারি খাপে পুরতে ইশারা করে বলল, “খড়্গবর্মা, এ পাজীটা প্রাণের ভয়ে আগে থেকেই কাঁপছে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা চালিয়ে আর কি হবে। গণ্ডকজাতের এবং তাদের ফসলের কথা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই।” তার পর জীবদত্ত ঐ লুণ্ঠনকারীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, তুমি আমাদের কোথায় দেখলে বলত ? কি করে চিনলে আমাদের ?”

“হুজুর, আমি আপনাদের কোথাও এর আগে দেখিনি। আমার সাথী আপনাদের বনে দেখে ছিল। সেই আপনাদের পোশাক

আর অস্ত্রের কথা জানিয়ে ছিল। তাই আপনাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরেছি।" লুণ্ঠনকারী বলল।

"না তুমি দেখছি বুদ্ধিতে একেবারে বৃহস্পতি। কোথাও একটা আখড়া খুলে কিছু শিষ্য জুটিয়ে নিলেই তো পারতে, এসব লুণ্ঠনকারীদের দলে যোগ দিলে কেন? ভালকথা, এত পাথর উটের পিঠে চাপিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে বলত? কি করতে অত পাথর নিয়ে যাচ্ছ? বল।" পরিহাস করার স্বরে জিজ্ঞেস করল খড়্গবর্মা।

"হুজুর, আমাদের নেতা আমাদের রাজধানীতে একটা দুর্গ বানাতে চান। সেই জন্যই আমাদের নেতা স্বর্ণাচারিকেও নিয়ে যাচ্ছেন। ঐ দুর্গ বানাতে অনেক পাথর লাগবে। তাই এত পাথর আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কি করব আমাদের কাছে এই উট ছাড়া অন্য কোন বাহন তো নেই।" লুণ্ঠনকারী বলল।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত লুণ্ঠনকারীর সঙ্গে কথা বলছিল। অন্যদিকে পাহাড়ের উপর যে কি হচ্ছিল তা তাদের নজরে পড়েনি। অন্য লুণ্ঠনকারীরা উটের উপর পাথর চাপিয়ে পাহাড় থেকে নাবতে নাবতে দেখতে পেল তাদের দলের একজনের উট পড়ে গেছে। ওদের কাছে দাঁড়িয়ে আছে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত।

ঐ ক্ষত্রিয় যুবকদের দেখেই পাহাড়ের উপরের লুণ্ঠনকারীরা থমকে গেল। খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত তাদের কি ভাবে যে নাস্তানাবুদ করেছে তা তাদের মধ্যে কিছু লোক হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। সেই দুরবস্থার কথা তাদের মনে আছে। তারা ভোলেনি খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের তরবারির আঘাতের জ্বালা। খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত যে কি ভাবে তান্ত্রিক এবং লোমশ-ভূতকে তাড়া করতে করতে পাহাড়ের গুহায় ঢুকে গেল তাও তারা সচক্ষে দেখেছে।

"এই মরেছে, এখন আমাদের নেতা নেই। ঐ ক্ষত্রিয় যুবকরা আমাদের দেখে নিয়েছে। এখন তো আর রক্ষা নেই।

ওরা সোজা পাহাড়ের উপর এসে আমাদের উপর চড়াও করতে আসবে। আর দেরি নয়, এখন পালানো উচিত। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।" একজন লুণ্ঠনকারী বলল।

যে বিপদ আসছে তার হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সামনে মাত্র একটি পথই খোলা আছে। তা হল স্বর্ণাচারির কাছে গিয়ে সব জানিয়ে তার কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া। শুনেছি স্বর্ণাচারি এই ক্ষত্রিয় যুবকদের বন্ধু। একমাত্র সেই এখন এই বিপদের হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে পারে। চল, আর দেরি নয়, এখনই স্বর্ণাচারির কাছে যাওয়া যাক।" অন্য এক লুণ্ঠনকারী বলল।
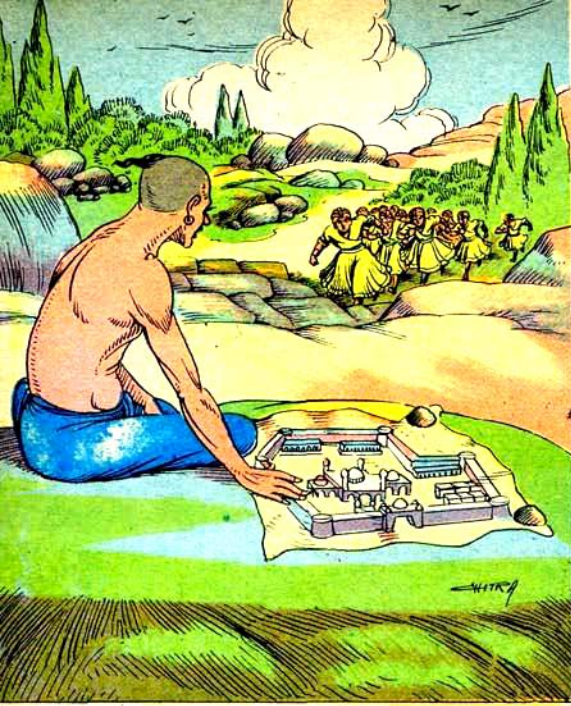
তারপর দশ-বার জন লুণ্ঠনকারী স্বর্ণাচারির কাছে ছুটে গেল। স্বর্ণাচারি তখন এক উঁচু পাহাড়ের উপর বসে লুণ্ঠন-নেতার জন্য দুর্গের নকশা আঁকছিল।

লুণ্ঠনকারীদের তার কাছে দাঁড়ানো দেখে, নকশা আঁকা থামিয়ে স্বর্ণাচারি গর্জে উঠে বলল, "আরে, তোমরা নিজেদের কাজকর্ম ছেড়ে এভাবে ছোটাছুটি করছ কেন? শিকার করে তোমাদের নেতা ফিরে আসুক, সব বলব তাকে, মজা টের পাবে।"

লুণ্ঠনকারীদের একজন কাঁপতে কাঁপতে বলল, "হুজুর, নেতার অনুপস্থিতিতে আপনি তো আমাদের নেতা। একটা উট পা হড়কে পাহাড়ের উপর থেকে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়ে গেছে। তার সাথে যে সাথী ছিল সেও পড়ে গেছে। ওদের পড়ে যাওয়া দেখতে পেয়েছে আপনার পুরানো ক্ষত্রিয় যুবক বন্ধুরা। উট আর আমাদের সাথী মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর ঐ যুবক দুজন তার পাশে দাঁড়িয়ে সাথীকে কি যেন জিজ্ঞেস করছে। আমাদের ভয় হচ্ছে, ওরা না শেষে এই আস্তানার খবর পেয়ে যায়।"

ক্ষত্রিয় যুবকদের নাম শুনেই স্বর্ণাচারি চমকে উঠল। দাঁড়িয়ে পড়ল মহানন্দে। লুণ্ঠনকারীদের কাছে সব কথা শুনে তার ধারণা হল ক্ষত্রিয় যুবক দুজন কাছাকাছি কোথাও এসে গেছে।

স্বর্ণাচারি পাহাড়ের নিচে নেবে আসতে আসতে লুণ্ঠনকারীদের বলল, "তোমরা এত ধানাই পানাই না করে ঝট করে বললেই পারতে যে ক্ষত্রিয় যুবকরা এসেছে। এখন চুপ করে আমার সঙ্গে চলে এস। তোমাদের কোন ভয় নেই, বুঝলে ?"

"ঠিক আছে আচার্য মশাই, আমাদের প্রাণে মারা পড়তে হবে না তো?" লুণ্ঠনকারীরা আশঙ্কা ও সন্দেহ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করল।

"ওরে ভীতুর দল, তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন ? ওরা তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না। তোমাদের বাঁচাতে, প্রয়োজন হলে, আমি প্রাণ দেবো। তবে তোমরা কিন্তু খুব সাবধানে তাদের সাথে ব্যবহার করবে।" স্বর্ণাচারি ভাল করে বুঝিয়ে বলল তাদের।

তারপর পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে নাবতে নাবতে সে চেঁচিয়ে ডাকল খড়্গবর্মা ও জীবদত্তকে। খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত মাথা তুলে স্বর্ণাচারিকে দেখেই চিনতে পারল। তার পিছনে কয়েকজন লুণ্ঠনকারীকে দেখে খড়্গবর্মা বলল, "জীবদত্ত, আমার কেমন যেন সন্দেহ জাগছে। পদ্মপুরের বাস্তুশাস্ত্রী ও যন্ত্রের হাতী নির্মানকারী স্বর্ণাচারি এই লুণ্ঠনকারীদের দলে যোগ দেয় নি তো ! আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। খড়্গবর্মার কথা শুনে জীবদত্তের

জীবদত্ত হাসতে হাসতে স্বর্ণাচারির পিঠ চাপড়ে বলল, "স্বর্ণাচারি, কেমন আছ? লুণ্ঠন নেতার জন্য জাদুর হাতী বা ঘোড়া বানাচ্ছো না তো? আমরা ভেবেছিলাম এদের হাতে পড়ে তোমাকে খুব কষ্ট পেতে হচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে তুমিও লুণ্ঠনকারীদের ছোট খাট নেতা হয়ে গেছ।"

এই কথা শুনে স্বর্ণাচারি কিছুক্ষণ পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে পরে হাত জোড় করে বলল, "আপনারা একবার আমাকে বাঁচিয়েছেন তার জন্য সারা জীবন আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি নিরুপায় হয়ে লুণ্ঠন নেতার জন্য একটা দুর্গ তৈরির আয়োজন করছি। কাজটা শেষ হয়ে গেলেই আমি নিজের পথ ধরব। ফিরে যাব বিঘ্নেশ্বর পূজারীর কাছে। এক সঙ্গে আমরা কোন বনে গিয়ে তপস্যা করব।"

মনেও সন্দেহ জাগল। স্বর্ণাচারিকে এরা জোর করে ধরে এনেছে। বলা যায়না পরে স্বর্ণাচারির সঙ্গে ওদের হয়ত বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।...

"খড়্গবর্মা বিন্ধ্যাচল পৌঁছানো পর্যন্ত আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। আমরা তো স্বর্ণাচারিকে মুক্ত করতেই এসেছি। এখন দেখা যাক স্বর্ণাচারির কি মতলব আছে।" জীবদত্ত বলল।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত নিজেদের মধ্যে কথা বলছে এমন সময় চারজন লুণ্ঠনকারী সহ স্বর্ণাচারি তাদের কাছে এসে শ্রদ্ধা ভরে নমস্কার করল। তারপর পালা করে প্রত্যেক লুণ্ঠনকারী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

বিঘ্নেশ্বর পূজারী গণ্ডকজাতের অরণ্যপুরে আরামেই আছে। এখানে তুমি ভাল আছ তো? এবার আমরা নিজেদের পথ ধরব।" জীবদত্ত বলল।

একথা শুনে স্বর্ণাচারি বিহ্বল হয়ে বলল, "আপনারা আমার আতিথ্য গ্রহণ না করে চলে যাবেন? তা কখনই হতে পারে না। আপনারা দয়া করে আজকের দিন আর রাতটা আমার এবং সমরবাহুর অতিথি হিসেবে কাটিয়ে যান।

"সমরবাহু আবার কে ?" জীবদত্ত অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

"ভাল কথা, আপনারা কি লুণ্ঠন নেতার নাম শোনেন নি। সিন্ধু রেগিস্থান থেকে আসা লুণ্ঠন নেতার নাম ওটা। এখন সে আস্তানায় নেই। দুজন অনুচর নিয়ে সে শিকার করতে বনে বেরিয়ে পড়েছে। চলুন এবার।" বলতে বলতে স্বর্ণাচারি এগিয়ে যেতে লাগল।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত তার পেছনে যেতে যেতে আহত লুণ্ঠনকারীকে দেখিয়ে বলল, "একে কাঁধে তুলে তোমাদের নিয়ে যেতে হবে।"

তৎক্ষণাৎ দুজন লুণ্ঠনকারী ঐ আহত সাথীটিকে তুলে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা সবাই লুণ্ঠনেতার আস্তানায় পৌঁছাল। ভালুকের চামড়া জড়িয়ে একটা লোক সেখানে বসে আছে। তাকে ঘিরে আছে কয়েকজন লুণ্ঠনকারী। ওরা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছিল। খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত সহ স্বর্ণাচারিকে দূর থেকে আসতে দেখে তারা এক ছুটে তাদের কাছে গেল।

"তা তোমার এত অস্থিরতা কিসের ? তুমি কি ভালুকের বেশ পরে এখানে নাচা নাচি করার তালে আছ নাকি ?" স্বর্ণাচারি বলল।
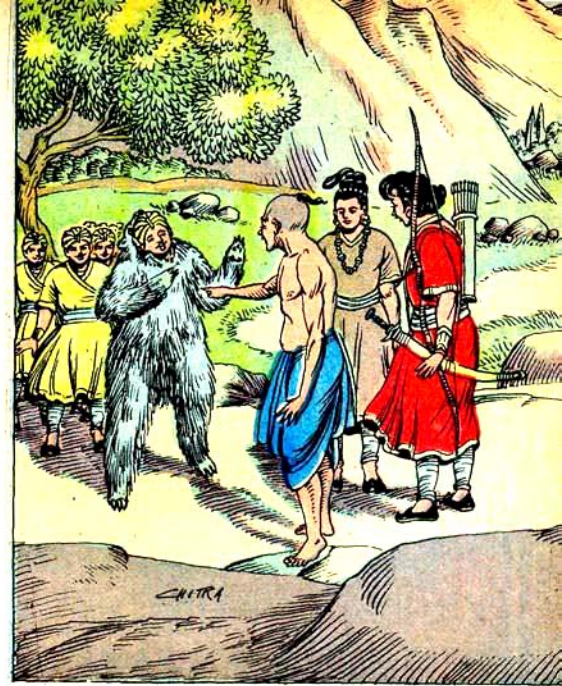
ভালুকের চামড়া পরা লোকটা স্বর্ণাচারির সামনে এসে মাথা নত করে নমস্কার করে বলল, "স্বর্ণাচারি মশাই, আমি এই চামড়া শখ করে পরিনি। আজ সকালে নেতার সাথে আমিও শিকার করতে বেরিয়ে ছিলাম। আমাদের নেতাকে জঙ্গলী জাতের ভয়ঙ্কর নেতা বন্দী করে নিয়ে গেছে। আমি কোন রকমে ঐ জঙ্গলীদের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে এসেছি।"

"লুণ্ঠনকারীদের নেতা সমরবাহুকে কি জঙ্গলবাসীরা ধরে নিয়ে গেছে ? এত বড় বীরকে বন্দী করার মত জঙ্গলবাসী এতদঞ্চলে কোথায় আছে ?" খড়্গবর্মা হাসতে হাসতে বলল।

"খড়্গবর্মা, সে যত বড় পাজীই হোক না কেন, এখন এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে সে তার চেয়ে বড় পাজীর খপ্পরে পড়ে গেছে। ওভাবে হাসবে না। বেচারার এতক্ষণে কি অবস্থা হয়েছে কে জানে।" জীবদত্ত বলল।

লুণ্ঠন নেতার বন্দী হওয়ার খবর শুনে স্বর্ণাচারির মনে নানা আশঙ্কা জাগতে লাগল। তার নিজেরও তো অভিজ্ঞতা আছে। সেও তো একদিন বন্দী হয়ে ছিল লুণ্ঠনকারীদের হাতে। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রহর গুনতে হয়েছে তাকে। তার পর ধীরে ধীরে লুণ্ঠনকারীরা তার সাথে ভাল ব্যবহার করতে লাগল। শেষে একদিন লুণ্ঠন নেতার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠল।

"হে ক্ষত্রিয় বীরগণ, মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেল। আপনারা অপরিসীম শক্তির অধিকারী। যে কোন ভাবে জঙ্গল-বাসীদের হাত থেকে সমরবাহুকে উদ্ধার করুন।" স্বর্ণাচারি কাতর কণ্ঠে বলল।

জীবদত্ত খড়্গবর্মার দিকে তাকাল। খড়্গবর্মা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা নেড়ে বলল, "জীবদত্ত, এ ব্যাপারে কি করবে না করবে তা ঠিক করার ভার তোমার। আমাদের বন্ধু স্বর্ণাচারির অনুরোধ তো আর আমরা ফেলতে পারি না। লুণ্ঠন নেতাকে বাঁচাব কিনা ঠিক কর। তুমি যা বলবে তাই হবে।"

জীবদত্ত কিছুক্ষণ ভেবে ভালুকের চামড়া পরা লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, "ওহে, তোমার নেতা আর তার অনুচরকে জঙ্গল-বাসীরা বন্দী করল কী ভাবে? জঙ্গলে কি ঘটে ছিল সব ভাল করে বুঝিয়ে বল দেখি?"

ভালুকের চামড়া পরা লোকটা বলল, "হুজুর, সমস্ত ঘটনা অল্প কথায় বলছি। আপনারা তাড়াতাড়ি গিয়ে আমাদের নেতাকে উদ্ধার না করলে ঐ নরখাদক আমাদের নেতাকে হয়ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলবে।" (আরও আছে)

গরিবের দম্ভ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে আগের মত নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলে উঠল, "রাজা, তোমার জিদ দেখে আমি খুশী হয়েছি কিন্তু জান তো জিদ মাঝে মাঝে জীবন নিয়ে টানাটানি করে। কিংশুকের কাহিনী শুনিয়ে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করছি। শুনলে অবশ্য তোমার কষ্ট লাঘব হবে।"

বেতাল শুরু করল: মণিপুর রাজ্যে অত্যন্ত গরিব একটা লোক বাস করত। তার কোন ঘর বাড়ি ছিল না। ছিল না কোন আপনজন। এই ধরণের লোক সাধারণত ভিক্ষে করে অথবা খেটে খুটে দিন আনে দিন খায়। কিন্তু কিংশুকের স্বভাব

বেতাল কথা

ছিল অদ্ভুত। সে খেটে রোজগার করত না আবার ভিক্ষেও করত না। কেউ তাকে ডেকে খেতে দিলে খেত। আর যেদিন কেউ খেতে দিত না সেদিন সে পুকুরের জল খেয়ে গাছের নিচে শুয়ে পড়ে থাকত।

তার কথা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। তার মেজাজের ব্যাপার নিয়ে অনেকে আলোচনা করত। অনেকে বলত, "যে খেতে পায় না তার অত দেমাগ কিসের!" যার দয়া হয় সে কিছু এনে তাকে খেতে দিত। সারাদিন কিংশুক ঘোরাঘুরি করত লোকালয়ে। খেতে পেলে খেত, না পেলে না। নিজে কোন দিন কারো কাছে হাত পেতে চাইত না।

কিংশুকের কথা মণিপুরের রাজার কানেও গেল। রাজমহল থেকে রাজা বেরুলে তার অনুচররা তাকে দেখিয়ে বলল, "মহারাজ, এই সেই দাম্ভিক ভিখিরী কিংশুক।" রাজা মনে মনে ঠিক করল সময়মত একবার লোকটাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

একদিন সন্ধ্যার সময় রাজা প্রাসাদের ছাদে বেড়াচ্ছিল। রাজা দেখতে পেল উদ্যানের এক কোণে ভিখিরী কিংশুক শুয়ে ছিল। দেখে মনে হয় যেন সে দু তিন দিন খেতে পায়নি। তার শরীরে যেন উঠার ক্ষমতাও নেই।

রাজা এক চাকরকে ডেকে বলল, "ঐ উদ্যানে যে লোকটা শুয়ে পড়ে আছে তাকে খাবার এবং দুধ দিয়ে এস।"

চাকর এক থালায় খাবার আর এক গেলাসে দুধ নিয়ে গিয়ে কিংশুককে বলল, "তুমি এই খাবার আর দুধ খেয়ে নাও।"

কিংশুকের পেটে প্রচণ্ড খিদে কিন্তু তার দেমাগ ঠিক আছে। সে খাবার দেখে মনে মনে খুশী হলেও দম্ভভরে চাকরকে জিজ্ঞেস করল, "এই খাবার কে পাঠিয়েছেন?"

"রাজা পাঠিয়েছেন?" চাকর রাজ-প্রাসাদের ছাদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে জবাব দিল।

কিংশুক মাথা তুলে রাজপ্রাসাদের ছাদের দিকে তাকাল। কিন্তু তখন সেখানে রাজাকে দেখতে পেল না।

ভেতরে ভেতরে খিদের জ্বালায় সে ছটফট করছিল। তাই সে আর কথা না বাড়িয়ে খাবার এবং দুধ খেয়ে নিয়ে বলল, রাজাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবে।"

চাকর থালা আর গেলাস নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে ফিরতে ফিরতে বলল, "কাল থেকে তোমাকে আর খিদের জ্বালা সহ্য করতে হবে না। তোমার উপর রাজার নজর পড়েছে। যখনই তোমার খিদে পাবে সোজা এখানে চলে আসবে। পেট ভরে খেতে পাবে।"

রাজার চাকর কিংশুককে ভিখিরী ভেবে নিয়েছিল। কথাটা শুনে কিংশুকের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিন্তু সে কোন জবাব দিল না। এতদিন সে যত লোকের অতিথি হয়েছে তারা সব সাধারণ লোক। আজ থেকে সে রাজার অতিথি।

পরের দিন কিংশুক সারা শহরে পাগলা কুকুরের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাকে সেদিন কেউ ডেকে খেতে দিল না। তৃতীয় দিনও সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরে দেখল কেউ তাকে খেতে ডাকছে না। অগত্যা সে আবার সেই রাজার উদ্যানে গিয়ে গাছের নিচে শুয়ে পড়ল।

সেদিন সন্ধ্যায়ও রাজার চাকর খাবার, মাংস, ফল, ক্ষীর এনে কিংশুকের সামনে

রেখে তাকে বলল, "তোমাকে তো আমি বলেছিলাম তুমি এখানে প্রত্যেক দিন ভাল ভাল খাবার পাবে। তবু তুমি এলে না কেন? কোথায় ছিলে এ দুদিন?"

"এই বাগানে শুতে আমার খুব ভাল লাগে। তাই বলে খিদে পেলেই যে আমি এই বাগানে আসি তা নয়। আবার যখন তখন আসলে রাজা হয়ত ভাববেন আমি এখানে খাবার লোভেই আসি।" কিংশুক বলল।

তার পর সমস্ত খাবার তাড়াতাড়ি খেয়ে সেখান থেকে সে চলে গেল। আবার পর পর সাত দিন ধরে তার আর কোন পাত্তা নেই।

সাতদিন পরে রাজা কিংশুককে দেখে অবাক হয়ে গেল। বাগানে তার হাঁটা দেখে রাজার মনে হল যেন কঙ্কাল চলেছে। রাজা ডেকে পাঠাল নিজের চাকরকে। নিজে যে খাবার খায় সেই খাবার তাকে দিয়ে আসতে বলল রাজা। দূর থেকে খাবারের সুগন্ধ পেয়ে কিংশুক মনে মনে খুশী হল। ঢাকনা খুলে দেখে তাতে রাবড়ি মালাই প্রভৃতি দামী খাবার রয়েছে।

সেই খাবার খেয়ে কিংশুক সেই যে গেল আর দশ দিনের মধ্যে সে ঐ মুখো হল না। রাজার মনে আশঙ্কা জাগল কিংশুক মারা গেছে কিনা। রাজা অনুচরদের পাঠাল তার খোঁজ করতে।

মৃত্যুপথযাত্রী কিংশুককে অনুচরেরা ধরে এনে রাজার সামনে হাজির করল। তার অবস্থা দেখে কারও চোখে পলক পড়ল না।

তার অবস্থা দেখে রাজার চোখ জলে ভরে গেল। রাজা বলল, "কিংশুক আমাকে ক্ষমা কর।"

"মহারাজ, দোষ তো আমার। আপনার কোন দোষ নেই।" কথাটা শেষ হতেই কিংশুকের ঘাড় কাৎ হয়ে গেল। সে মারা গেল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বিক্রমাদিত্যকে বলল, "মহারাজ, কিংশুক রাজার সুস্বাদু খাবার খেয়েও মরতে বসল কেন?

কিংশুকই বা বলল কেন যে দোষ তার নিজের ? এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও উত্তর না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

এ কথায় বিক্রমাদিত্য বললেন, "যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে কিংশুক আগে যা পেত তাই খেত। তাতে তার কোন অসুবিধা হত না। কিন্তু রাজার দেওয়া খাবার খাওয়ার পর থেকে সে অন্যের দেওয়া খাবার খেতে পারত না। তাই সে দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে যেতে লাগল। রাজা কিংশুককে খেতে দিয়েছিল পরীক্ষা করতে। তার প্রতি দয়া দেখানোর জন্য নয়। রাজা ভেবেছিল কিংশুক তার খাবারের লোভে প্রত্যেকদিন তার উদ্যানে আসবে। ফলে তার অহংকার বা দম্ভ চূর্ণ হবে। প্রথম প্রথম মনে হল রাজার পরিকল্পনা সফল হতে চলেছে। কারণ কিংশুক দুবার শুধু খাবার লোভেই উদ্যানে গিয়েছিল। কিন্তু যখন সে টের পেল যে তার দম্ভের খুঁটি নড়ে যাচ্ছে তখন সে দম্ভ ঠিক রাখার জন্য বদ্ধপরিকর হল। ফলে মৃত্যুর দিকে ছুটে গেল। রাজা ভাবতেই পারেনি যে সে নিজের জীবন নিয়ে এভাবে খেলা করবে। কিংশুকের মৃত্যুর কারণ রাজার পরীক্ষা। এই কথা বুঝে রাজা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে ছিল। আবার কিংশুক নিজের দোষ স্বীকার করার কারণ সেও ভেবেছিল যে পর পর দুবার রাজা দয়া করেছেন ভেবে উদ্যানে না এলে সে বেঁচে থাকতে পারত। আসাটাই তার অন্যায় হয়েছে। রাজার মতলব বুঝতে না পারা তার ভুল হয়েছে। রাজা যে তার দম্ভ চূর্ণ করার পরিকল্পনা করেছে এটা বুঝতে না পারাটাই কিংশুকের মস্ত বড় দোষ হয়েছে।"

রাজার এই ভাবে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শবের সাথে হাওয়া হয়ে গেল। ঝুলে পড়ল আবার সেই গাছে। (কল্পিত)
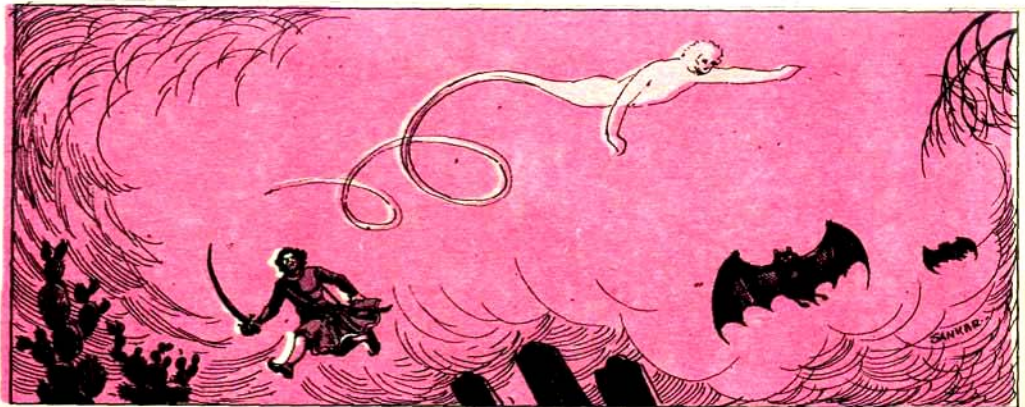
মূর্খ রাজা

প্রাচীনকালে তিরুচিনা পল্লীতে রাজা শুরসেন শাসন করত। সে ছিল মূর্খ কিন্তু তার মন্ত্রীর সুবুদ্ধি ছিল প্রখর ও তীক্ষ্ণ।

একদিন রাজা লক্ষ্য করল নদীর জল পূবদিকে বইছে। সে সুবুদ্ধিকে বলল, "দেখ মন্ত্রী, ঐ পূবদিকে যে তাঞ্জাউর রয়েছে সেই দেশের রাজা আমাদের শত্রু অথচ আমার দেশের জল দিয়ে ওরা ফসল ফলাবে, এ কখনই হতে পারে না। তুমি এক্ষুনি বাঁধ দিয়ে দাও যাতে নদীর জল ওদেশে যেতে না পারে।"

মূর্খ রাজাকে বোঝানো বৃথা ভেবে মন্ত্রী ওপথে গেল না। এক মাসের মধ্যে একটা বাঁধ তৈরী করাল। নদীর জল উপছে পড়ল। বন্যা হল। দেশের মানুষ রাজাকে ভীষণ ভয় পেত। তাই তারা মন্ত্রীকে নিজেদের দুঃখের কথা শোনাল। তার পর ঘণ্টাবাদককে ডেকে মন্ত্রী বলল, "তুমি আজ রাত্রে আধ ঘণ্টা অন্তর ঘণ্টা বাজাবে আর মাঝ রাত্রে ভেরি বাজিয়ে দেবে।"

রাজা মাঝ রাত্রে ভেরির আওয়াজ শুনে উঠে পড়ল। রাজার ধারণা সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু পূব দিকে সূর্যের পাত্তা নেই। রাজা মন্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "আজ, এখনও সূর্য উঠছে না কেন? সকাল তো হয়ে গেছে অনেকক্ষণ?"

"মহারাজ, আমরা বাঁধ দিয়ে জল আটকেছি তো তাই তাঞ্জাউরের লোক হয়ত সূর্যকে আটকেছে।" মন্ত্রী জবাবে বলল। "ওরে বাবা, তাই নাকি? তাহলে তাড়াতাড়ি বাঁধ ভেঙ্গে ফেল।" রাজা মন্ত্রীকে হুকুম করল।

কিপটে ব্যবসাদার

কুন্তীপুরগ্রামে ছিল এক ধনী ব্যবসাদার। নাম তার উপল। তার ছেলের নাম বিষ্ণু। ভাল ছেলে। লেখাপড়া করত। বাপের কারবার তার পছন্দ হত না। বড় হয়ে সে ন্যায্য দামে তরিতরকারীর ব্যবসা আরম্ভ করল।

ঐ গ্রামেই একটি চৌধুরী পরিবার ছিল। ঐ পরিবারের কর্তা দীনু চৌধুরীর এক সময় খুব নাম ডাক ছিল। টাকাও ছিল খ্যাতিও ছিল। বেচারা অংশীদারের কাছে ধোকা খেয়ে একেবারে বসে গেল।

দীনুর মেয়ে লতা খুব শান্ত মেয়ে। তার রুচি ছিল উচ্চ মানের। বিয়ের বয়স হয়ে ছিল লতার। কিন্তু গরিব বাবা মেয়ের জন্য কোন যোগ্য পাত্র যোগাড় করতে পারল না।

কিপটে উপলের বড় আশা ছিল তার ছেলের সাথে এক রাজকুমারীর বিয়ে দেবে। সে আনবে অর্দ্ধেক রাজত্ব। আসলে লতা সব দিক থেকে বিষ্ণুর যোগ্য পাত্রী ছিল। বিষ্ণুকে দেখে লতার মা মনে মনে ভাবে, এ রকম একটা লোককে জামাই করতে পারলে কত ভাল হত।

বিষ্ণু লতাকে দেখে বউ করে নেবার কথা ভাবত। একদিন দীনুর বউ স্বামীকে বলল, একবার উপলের সাথে দেখা করে, লতাকে তার বউমা করে নিতে বল না? বিষ্ণু ছেলেটাতো ভাল। এত ভাল সম্বন্ধ আমরা আর কোথায় পাব।"

"ওসব কথা ভুলে যাও। উপল নিজের ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা এমন ঘরে করতে চায় যাতে তার বেশ কিছু সম্পত্তি বাড়ে।"

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

দীনুর বউ বিষ্ণুকে একদিন বাড়িতে খেতে ডাকল। খাবার সময় কথায় কথায় মনের কথা প্রকাশ করল।

"আমার তো কোন আপত্তি নেই। আপনার মেয়ে সুন্দরী, বেশ শান্ত। এক সময় আপনার পরিবার গ্রামের নামকরা পরিবার ছিল। এখন হয়ত আপনারা গরিব হয়ে গেছেন। শুধু আপনার মেয়ে পেলেই ধন্য হতাম। আর কিছু নিতাম না। কিন্তু আমার বাবার যা খাঁই সেই খাঁই পুরণ করার ক্ষমতা কার আছে। আপনার পক্ষে তাঁর খাঁই মেটানো সম্ভব নয়। ইচ্ছা থাকলেও আমার উপায় নেই। আপনারা বরং অন্য পাত্রের সন্ধান করুন।" বিষ্ণু বলল।

বিষ্ণু ও লতার মার মধ্যে যখন কথাবার্তা হচ্ছিল তখন সেখানে লতার মামা শ্যামগুপ্ত ছিল। তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ছিল খুব। সমস্ত কথা শুনে সে বলল, "ঠিক আছে। ছেলের যখন আমাদের লতাকে পছন্দ তখন বাকি কাজের ভার আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি দেখছি।"

পরের দিন সকালে শ্যামগুপ্ত উপলের বাড়িতে গেল। একথা সেকথার পর সে বলল, "ভালকথা আপনি লতাকে আপনার বউমা করে আনলেই তো পারেন। বিষ্ণুতো বড় হয়েছে। জ্ঞান বুদ্ধিও তার আছে।"

"বেশ বলেছেন। আরে যাদের এবেলা চলে তো ওবেলা চলে না তাদের ঘরের
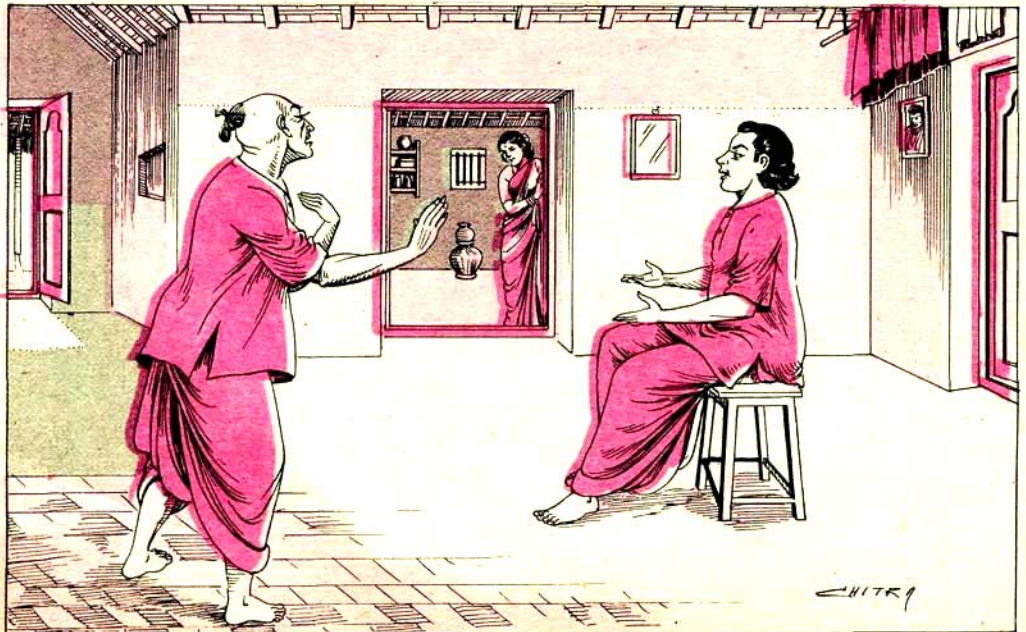
মেয়েকে ছেলের বউ করে আনলে কি পাব? এ কখনই হতে পারে না।” উপল জবাবে বলল।

এ কথায় কোন রকম বিচলিত না হয়ে শ্যামগুপ্ত বলল, “তাহলে আপনি হয়ত আমার ভাগ্নির অদ্ভুত শক্তির কথা জানেন না। সে তো জলে একবার ফু দিয়ে অসাধারণ মিষ্টি জল করে ফেলতে পারে।”

উপল বিস্মিত হয়ে বলল, “কি বললেন, মিষ্টি জল? কি করে সম্ভব?”

“আজ্ঞে আপনি তো ছেলের বিয়ের ব্যাপারে কত পাবেন তারই হিসেব করেন। পণের টাকার কি দাম আছে! আজ আসে কাল চলে যায়। লতার মত মেয়েকে ছেলের বউ করে ঘরে আনলে মিষ্টি জল বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা রোজগার করতে পারবেন।” শ্যামগুপ্ত বলল।

লাখ লাখ টাকার কথা কানে যেতেই উপল চঞ্চল হয়ে উঠে বলল, “এ কি সত্য? এ কি সম্ভব?”

“আজ সন্ধ্যেয় বোনের বাড়িতে আসুন না একবার। আপনি নিজে যাচাই করে দেখুন না আমি যা বলছি তা সত্য না মিথ্যা। ভাল কথা, আপনি যাওয়ার সময় এক গ্লাস জল নিয়ে যাবেন।” শ্যামগুপ্ত বলল।

সেদিন সন্ধ্যায় ছেলে আর বউকে সঙ্গে নিয়ে উপল দীনু চৌধুরীর বাড়ি গেল। উপলের বউ লতাকে দেখে আর গুণের
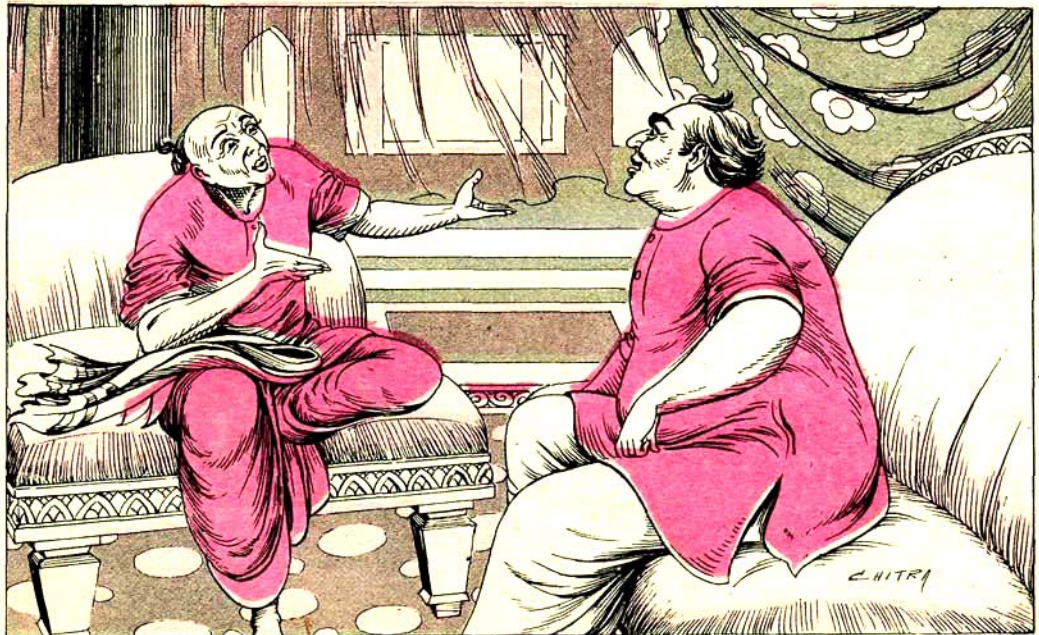
কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে মনে মনে লতাকে ছেলের বউ করে নেয়।

উপল ঐ গ্লাসের জল লতার হাতে দিয়ে বলল, "আমি জল এনেছি। তোমার মামার কাছে শুনেছি তুমি নাকি সাধারণ জলে ফুঁ দিয়ে মিষ্টি জল করে ফেলতে পার।"

লতা উপলকে বলল, "আপনি একটু জল খেয়ে যাচাই করে দেখে নিন।"

উপল একটু জল খেয়ে নিয়ে বলল, "এই জলের স্বাদ সাধারণ জলের মতই লাগছে।"

লতা উপলের হাত থেকে জল নিয়ে একবার ফুঁ দিয়ে তার হাতে ফেরত দিয়ে বলল, "এবার এই জলের স্বাদ কেমন লাগে খেয়ে দেখুন।"

উপল ঐ জল খেয়ে আনন্দে চোখ মুখ উজ্জ্বল করে বলল, "এতো অদ্ভুত ব্যাপার! মা, আমি তোমাকে আমার পুত্রবধূ করে নিতে চাই। আমি এক্ষুনি এই সোনার হার দিয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করতে চাই।"

লতা ও বিষ্ণুর বিয়ে ঘটা করে হল। দীনু চৌধুরীর এক পয়সাও খরচ হল না সেই বিয়েতে। সমস্ত খরচের ভার উপল নিজেই ঘাড়ে নিল।

বিয়ের পর বিষ্ণু লতাকে বলল, "হ্যাঁগো, তুমি কি করে পারলে বলতো, সাধারণ জল মিষ্টি করতে?"

"ওহে বীর পুরুষ ধরতে পারনি? জলে স্যাকারিন মিশিয়ে ছিলাম। তোমার বাবার কাছ থেকে গেলাসটা নেবার সময় স্যাকারিন লাগানো আঙুল ডুবিয়ে ছিলাম ঐ জলে। ফলে জল মিষ্টি হয়ে গেল।" লতা বলল।

"তাহলে এখন কি করবে?" বিষ্ণুর প্রশ্ন।

"কি আর করব। বলব, বিয়ের পর আমার পদবী বদলের সাথে সাথে আমার ঐ বিচিত্র ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। আর যা বলার তা তুমি আর তোমার মা গুছিয়ে বলবে।" লতা হাসতে হাসতে চটপট বলে ফেলল।
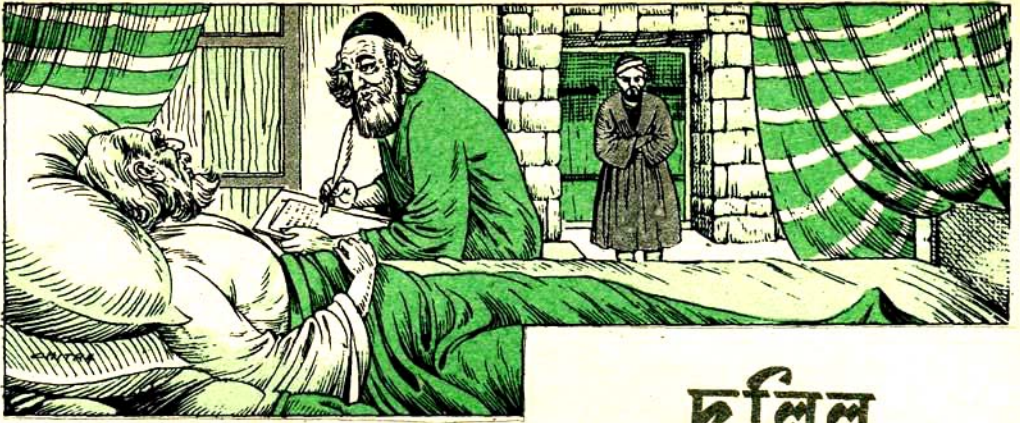
দলিল

জেরুজালেম শহরে এক নাম করা ব্যবসাদার ছিল। তার একটি মাত্র ছেলে ছিল। ব্যবসাদার দূর দূর দেশে গিয়ে ব্যবসা করত। তার ছেলে বাড়িতে পড়াশুনা করত। যাবার সময় ব্যবসাদার একজন গোলামকে সঙ্গে নিয়ে যেত।

একবার ব্যবসাদার দূর দেশে গিয়ে অসুখে পড়ে গেল। অনেক দিন কেটে গেল কিন্তু অসুখ আর সারে না। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে ব্যবসাদার নিজের একমাত্র ছেলে সম্পর্কে ভাবতে লাগল। কত কথা তার মনে জাগল। ছেলে এখনও ছোট। এখনই ছেলের নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিলে গোলাম সব কিছু হাতড়ে নিয়ে তাকে পথে বসাবে। অনাথ করে দেবে। কী করলে যে সাপও মরবে অথচ লাঠিও ভাঙ্গবে না ভেবে পাচ্ছিল না। ব্যবসাদার মনে মনে কি যেন ঠিক করে নিল।

ব্যবসাদার গোলামকে পাঠাল শহর থেকে এক দলিল লেখককে ডেকে আনতে। দলিল লেখক এল। লোকটা অভিজ্ঞ এবং সৎ। ব্যবসাদারের বক্তব্য অনুসারে দলিল লেখক লিখে গেল। সেই দলিল অনুসারে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হল গোলাম। দলিলের শেষে লেখা ছিল অন্য কথা। ব্যবসাদারের ছেলে ইচ্ছে করলে যে কোন একটা জিনিস ঐ সম্পত্তি থেকে নিতে পারে। এই ছিল ঐ দলিলের বয়ান।

ব্যবসাদার দলিল লেখানোর কিছু দিনের মধ্যেই মারা যায়। তার গোলাম দলিল নিয়ে তাড়াতাড়ি জেরুজালেম ফিরে এল।

ইহুদী লোককথা

দলিলের বয়ান অনুসারে ব্যবসাদারের সমস্ত সম্পত্তি গোলাম দখল করে নিল।

বাবার মৃত্যুর পর ব্যবসাদারের ছেলে গোলামের কাছে সমস্ত সম্পত্তি চাইল।

গোলাম সম্পত্তি দিতে রাজী না হয়ে ঐ দলিল দেখিয়ে বলল, "এই দলিল অনুসারে তুমি কোন একটা জিনিস চেয়ে নিতে পার।"

ব্যবসাদারের ছেলে দলিলের বয়ান পড়ে আশ্চর্য হল। সে ভাবতেই পারল না কি করবে। শেষে সে বাপের এক বন্ধুর কাছে গিয়ে পরামর্শ চাইল।

ব্যবসাদারের বন্ধু ছিল বৃদ্ধ এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। বন্ধুর ছেলের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে বলল, "তুমি বাছা অত ভেব না। অত চিন্তার কোন কারণ নেই। এতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তোমার বাবা এভাবে দলিল লিখিয়ে তোমার মস্ত বড় উপকার করেছেন। এক কাজ কর, কাল তুমি বিচারালয়ে এস। গোলামকেও বল বিচারালয়ে যেতে। সেখানে আমি যা বলব তাই করবে। তাতে তোমার উপকার হবে।"

পরের দিন ব্যবসাদারের ছেলে ও গোলাম বিচারালয়ে গেল। বিচারক দলিলের বয়ান পড়ল। বিচারক দলিল পড়ে ব্যবসাদারের ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, "দলিলের বয়ান শুনলে তো? তোমার বাবার সম্পত্তির কোন্‌টা তুমি চাও বল, তুমি পাবে।"

এই প্রশ্নের জবাব আগে থেকেই বাবার বন্ধুর কাছ থেকে শিখে রেখেছিল ব্যবসাদারের ছেলে। সে তার বাপের গোলামের দিকে তর্জনি দেখিয়ে বলল, "আমি এই গোলামকে চাই।"

বিচারক গোলামকে ব্যবসাদারের ছেলের অধীন করে দিল। এই ভাবে গোলামের নামে লিখে দেওয়া সমস্ত সম্পত্তির মালিক হল ব্যবসাদারের ছেলে।
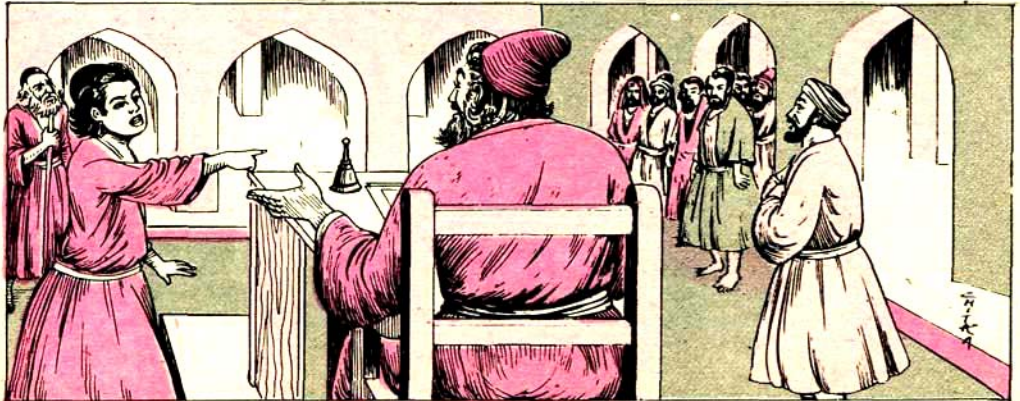
বরের পরীক্ষা

মালব দেশের রাজা মতিমন্তের এক সুন্দর কন্যা ছিল। নাম তার চন্দ্রিকা। রাজা খুব আদর-যত্নে তাকে গড়ে তুললেন। মতিমন্ত পণ্ডিতদের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি নামকরা পণ্ডিতদের দিয়ে মেয়ের লেখাপড়া করাতেন।

চন্দ্রিকার বিয়ের বয়স হল। তার বিয়ের ব্যাপারে রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। দূত পাঠিয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে রাজকুমারদের ছবি আনানো হল।

ঐ ছবিগুলো দেখে চন্দ্রিকা বলল, "বাবা, এ ছবি দেখে আমি এদের জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় কি করে পাব? আমার চেয়ে বুদ্ধিতে যে খাট তাকে আমি বিয়ে করব না। আপনার কোন আপত্তি না থাকলে আমি রাজকুমারদের বুদ্ধির পরীক্ষা করে দেখতে চাই। সেই পরীক্ষায় যে সফল হবে তাকে আমি বিয়ে করব।"

রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে মেয়ের কথায় রাজী হলেন।

চন্দ্রিকা এই শ্লোকটি লিখে রাজার হাতে দিল।

"প্রাত র্দ্যূত প্রসঙ্গেন,
মধ্যাহ্নে স্ত্রী প্রসঙ্গতঃ
রাত্রৌ চোর প্রসঙ্গেন
কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।"

রাজা এই শ্লোকটিকে সভাভবনের এক শিলার উপর সোনার অক্ষরে লেখালেন। ব্যবস্থা করলেন স্বয়ম্বর সভার। বিভিন্ন দেশের রাজপুত্রদের কাছে খবর পাঠালেন।

এই খবর পেয়েই এক এক করে বহু দেশের রাজকুমার আসতে লাগল। সবাই

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐ শ্লোক পড়ে অর্থ করল এই ভাবে ঃ "সকালে জুয়া খেলার বিষয়ে আলোচনা করে, দুপুরে স্ত্রী সম্পর্কে কথা বলে, রাত্রে চোরদের সম্পর্কে আলোচনা করে বুদ্ধিমানরা নিজেদের সময় অতিবাহিত করেন।"

কিন্তু চন্দ্রিকার কাছে তার শ্লোকের এই অর্থ ভাল লাগল না। কিন্তু এ ছাড়া ঐ শ্লোকের আর যে কি অর্থ হতে পারে তা কেউ বুঝতে পারল না। রাজা ও রাণীর কাছে মেয়ের এ সব ব্যাপার একটু বাড়াবাড়ি মনে হল।

জয়সিংহ নামে এক যুবক এই খবর পেয়ে খুব উৎসাহিত হল। সে ছিল খুব বুদ্ধিমান। মনে মনে তার দারুণ ইচ্ছা ছিল রাজকুমারীকে বিয়ে করার। কিন্তু সে ছিল মালব দেশের সেনাপতির ছেলে। সে রাজার অনুমতি নিয়ে ঐ শ্লোকের সবিস্তার ব্যাখ্যা ও অর্থ দরবারে এই ভাবে পেশ করল ঃ

"এই শ্লোকে বুদ্ধিমানরা যে কি ভাবে সময় কাটায় তাই জানানো হয়েছে। অতএব বুদ্ধিমানদের দৈনন্দিন জীবনের ভিত্তিতেই শ্লোকটি রচিত। এই কথা মনে রাখলে এখানে জুয়ার অর্থ মহাভারতের দ্যুত বা জুয়া। একই ভাবে বিচার করলে স্ত্রীর ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে রামায়ণ। কৈকেয়ীর বর আর সীতার অপহরণ ছাড়া রামায়ণের কথা ভাবতেই পারি না। তাই স্ত্রী প্রসঙ্গ বলতে এখানে রামায়ণের আলেচনার কথাই বলা হচ্ছে। আর চোর প্রসঙ্গের অর্থ কৃষ্ণ প্রসঙ্গ। অতবড় নাম করা চোর কৃষ্ণ ছাড়া আর কে হতে পারে। এই ভাবে অর্থ করলে সম্পূর্ণ শ্লোকের অর্থ আশাকরি সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

জয়সিংহের অর্থ চন্দ্রিকার ভাল লাগে। চন্দ্রিকা বরমাল্য দিয়ে জয়সিংহকে বরণ করে নিল। সারম্বড়ে উভয়ের বিয়ে হল।

কাঠের ঘোড়া

তিন

বাদশাহ ভেবেছিলেন সকাল হতে না হতেই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ঐ যুবক মারা যাবে। আর তার মেয়ের নামে কোন বদনাম রটবে না। অনুচরের মাধ্যমে মন্ত্রীর কাছে তিমি খবর পাঠালেন। সকালের মধ্যে যেন তাঁর সমস্ত সেনা সাজানো হয়। তার পর বাদশাহ সারারাত কামর-অল-আকমরের সঙ্গে নানা কথা বলে কাটালেন।

সকাল হল। বাদশাহ কামরের জন্য ঘোড়া শালা থেকে একটা ভাল ঘোড়া আনতে বললেন সেপাইকে।

এ কথা শুনে কামর বলল, "আমি যে ঘোড়ায় চড়ে আপনার রাজ্যে এসেছি সেই ঘোড়াই আমার যথেষ্ট। অন্য কোন ঘোড়ার দরকার নেই।"

"ভাল কথা, তোমার যেমন ইচ্ছা।" বাদশাহ বললেন।

বাদশাহের সেনাবাহিনী সেজে দাঁড়িয়ে ছিল রণক্ষেত্রে।

বাদশাহ নিজের সেনাবাহিনীকে বললেন, "হে সৈনিকগণ, এই যুবক আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের দেশে এসেছে। এই যুবক দেখতে যেমন সুন্দর সাহসও রাখে তেমনি। এ বলে কিনা আমার সমস্ত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একাই লড়তে পারবে। সে নাকি লাখ লাখ সেনার বিরুদ্ধেও একাই লড়তে পারবে। এখন, ও যখন তোমাদের উপর হামলা করতে আসবে আমি আশা করব তোমরা সহজেই তাকে আক্রমণ করে পরাস্ত করতে

আরব দেশের লোককথা

পারবে। তার দম্ভ চূর্ণ করতে পারবে। সতর্ক হও, যুদ্ধে জয়ী হও।"

তার পর বাদশাহ কামরকে বললেন, "বাবা, তুমি সাহসের সঙ্গে লড়াই করে নিজের শক্তির পরিচয় দেবে। আমার সেনাবাহিনীকে দেখেই পালিয়ে যেয়ো না যেন। এ তোমার সম্মানের প্রশ্ন। তোমার সম্মান যেন ধূলোয় মিশে না যায়।"

সতর্ক কামর বাদশাহকে বলল, "হুজুর, আপনি কিন্তু আমার প্রতি অবিচার করছেন। আমি পায়ে হেঁটে এতগুলো ঘোড়সওয়ারের বিরুদ্ধে লড়ব কি করে ?"

আমি তো তোমাকে ঘোড়া দিতে চেয়ে ছিলাম। তুমিই তো নিতে চাইলে না। এখনও আমি দিতে প্রস্তুত। যে ঘোড়া চাইবে সেই ঘোড়াই তোমাকে দেব।" বাদশাহ বললেন।

"থাক, আপনার কোন ঘোড়াই আমার দরকার নেই। আমি যে ঘোড়ায় চড়ে আপনার দেশে এসেছি, সেই ঘোড়াই আমার যথেষ্ট।" কামর জবাবে বলল।

"তোমার সেই ঘোড়া কোথায় আছে বল। আনিয়ে দিচ্ছি।" বাদশাহ বললেন।

"আপনার প্রাসাদের ছাদে আছে।" কামর বলল।

বাদশাহ অবাক হয়ে বললেন, "আমার প্রাসাদের ছাদে ! ছাদে ঘোড়া থাকবে কি করে, বাবা ! না, তোমার দেখছি মাথাই
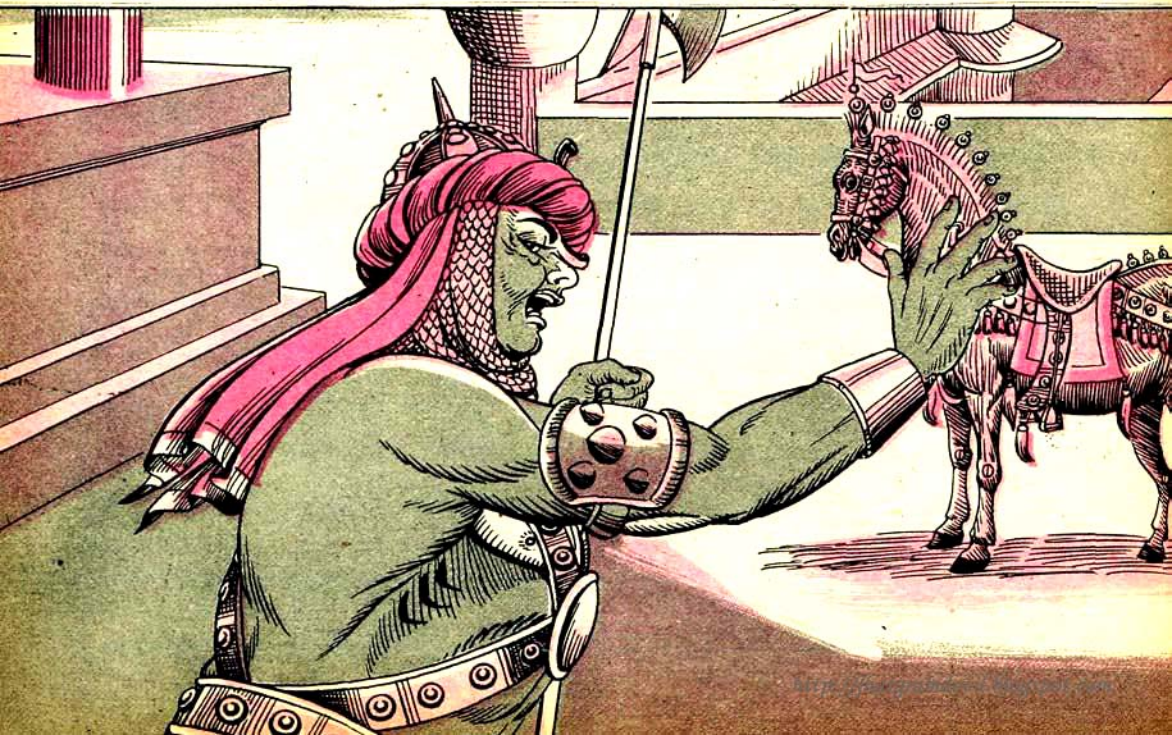
খারাপ হয়ে গেছে। তুমি যা বলছ তাতেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে তোমার মাথার ঠিক নেই। যাই হোক আমি ছাদে লোক পাঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখছি তোমার কথা সত্য কি না।" বাদশাহ এ কথা বলে সেনাপতিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "ছাদে গিয়ে কোন কিছু দেখতে পেলে তাড়াতাড়ি সেটা নিয়ে এস।"

কামরের কথা সেনাবাহিনীর লোক শুনে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, ঘোড়া প্রাসাদের এত সিঁড়ি ভেঙ্গে ছাদে উঠল কি করে। তা কি কখনও সম্ভব।"

ইতিমধ্যে বাদশাহের সেনাপতি ছাদে উঠে ঐ কাঠের ঘোড়াটাকে দেখল। কাছে গিয়ে ভাল করে দেখল। কি সুন্দর। হাতীর দাঁতের কাজ করা আছে। এই ধরণের ঘোড়া সে আগে কখনও দেখেনি। সেনাপতি ও তার সঙ্গীরা ঐ ঘোড়া দেখে হো হো করে হেসে উঠল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, "এটাই কি ঐ যুবকের ঘোড়া? এই দিয়ে সে যুদ্ধ করবে! ব্যাটা নির্ঘাৎ পাগল। তবু আসল ব্যাপারটা যে কি তা যতক্ষণ না জানতে পারছি ততক্ষণ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। চল, এটাকে বাদশাহের কাছে নিয়ে যাওয়া যাক।"

ওরা কাঠের ঘোড়াটাকে নিয়ে গিয়ে বাদশাহের সামনে রাখল। বাদশাহ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই তোমার ঘোড়া?"
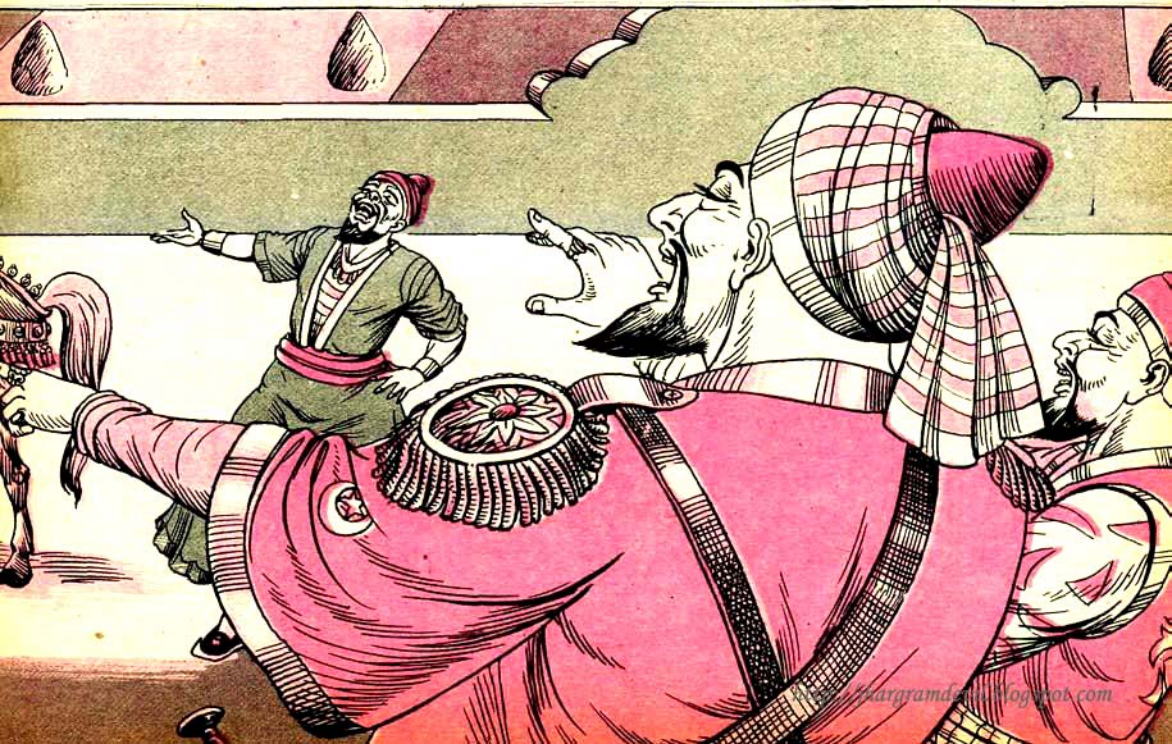
"আজ্ঞে হ্যাঁ। এই ঘোড়ার যে ক্ষমতা কতখানি আমি তা আপনাকে দেখাব।" কামর বলল।

"তাহলে দেখাও।" বাদশাহ বললেন।

"এই সেপাইরা সরে গেলে আমি ঘোড়ায় চড়ব।" কামর বলল।

বাদশাহ সেনাদের যেতে বললেন।

"হুজুর, আপনি লক্ষ্য রাখুন। আমি আপনার সেপাইদের উপর কি ভাবে আক্রমণ করছি। কিভাবে তাদের ছড়িয়ে সরিয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছি। ভাল করে দেখবেন সব।" কামর বলল।

"তোমার যা ইচ্ছে করবে। সেনাদের প্রতি তোমাকে কোন রকম দয়া দেখাতে হবে না আর সেনারাও তোমার প্রতি কোন রকম দয়া দেখাবে না।" বাদশাহ বললেন।

তৎক্ষণাৎ কামর ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। সেনারা ভেবেছিল কামর যখন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন তারা আক্রমণ করবে। বল্লম দিয়ে তাকে গেঁথে মাটিতে শুইয়ে দেবে। কিছু সেনা ভাবল এমন সুন্দর যুবককে মারব কি করে! বাকি সেনারা ভাবল যুবকটি নিশ্চয় পাগল। ওর মাথায় খেয়াল চেপেছে জিতে যাবে। ব্যাস, যুদ্ধ করতে চায়। পাগলের খেয়াল!

ঘোড়ায় চড়ে কামর কল টিপল। ঘোড়াটা একটু সামনের দিকে গেল। পরক্ষণে পিছিয়ে লাফাতে লাগল। তার পর উঠে গেল আকাশে। বিরক্ত হয়ে রাগে গজগজ করতে করতে বাদশাহ সেনাদের বললেন, "আরে বোকার দল! হাঁ করে দেখছ কি। ব্যাটা পালাচ্ছে আর তোমরা ধাওয়া করছ না। ঠায় দাঁড়িয়ে আছ।"

"হুজুর, উড়ন্ত পাখিকে কে ধরতে পারে। একে দেখে মনে হচ্ছে হয় তান্ত্রিক, না হয় ভূত বা পিশাচ। এখান থেকে পালিয়ে গেছে, ভালই হয়েছে। আল্লার আশীর্বাদে আমাদের কারো কোন ক্ষতি হল না। যা ঘটে গেল তাতে তো হুজুর আপনার খুশী হওয়া উচিত।" মন্ত্রীরা বাদশাহকে ভাল করে বুঝিয়ে বলল।

বাদশাহ একেবারে বিস্মিত হলেন। অন্দর মহলে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার মেয়েকে জানালেন। যাকে সে ভালবাসে তার চলে যাওয়ার খবর পেয়ে বাদশাহের মেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

বাদশাহ তাঁকে বোঝাতে বোঝাতে বললেন, "কাঁদছ কেন মা। ও নিশ্চয় কোন জাদুকর, নিশ্চয় খারাপ মতলব ছিল তার, চলে যাওয়াতে তো আমাদের ভালই হয়েছে। এতে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। খুশী হওয়া উচিত তোমার।"

মেয়েকে বোঝাতে কত চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন ফল হল না। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ওকে যতক্ষণ না দেখছি ততক্ষণ আমি কিচ্ছু খাব না।"

বাদশাহ মেয়ের দুঃখ দূর করা দূরে থাক নিজেই মেয়ের অবস্থা দেখে দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। সব কিছু অন্ধকার দেখতে লাগলেন।

এদিকে কামর ঐ কাঠের ঘোড়ায় করে নিজের দেশে ফিরে এল। ঐ রাজকুমারীর সাথে দেখা করার ইচ্ছা তারও মনে জাগতে লাগল। ইতিমধ্যে সে জানতে পারল ঐ দেশের নাম। নাম তার যমন আর রাজধানী যে নগরে ছিল তার নাম সনা। কিন্তু আবার সেই নগরে যাবে কি করে। কিভাবে যাবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না সে।

কাঠের ঘোড়া তীব্র গতিতে যাওয়ার ফলে সে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজের দেশ পারশ্যে ফিরতে পারল। সিরাজ নগরের চারদিকে উপর থেকে ঘুরে কামর নাবল একেবারে প্রাসাদের ছাদে। ছাদেই ঘোড়াটাকে রেখে মহলে ঢুকল কামর। লক্ষ্য করল যত্রতত্র ছাই ছড়ানো আছে। কামর ভাবল নিশ্চয় কেউ মারা গেছে। বাবার ঘরে এসে দেখল বাবা আর বোনেরা কান্নাকাটি করছে।

কামরকে দেখেই বাদশাহ আনন্দে চিৎ-কার করে উঠলেন। পরক্ষণেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান হওয়ার পর ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ছেলেমানুষের মত কান্নাকাটি করতে লাগলেন।

সবার কান্না যখন থামল তখন কামরকে তারা নানা ধরণের প্রশ্ন করল। কোথায় ছিল, কিভাবে ছিল ইত্যাদি।

সমস্ত কথা শুনে বাদশাহ সাবুর আল্লার অশেষ কৃপার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন। সাতদিন ধরে সমস্ত দেশবাসীকে নিমন্ত্রণ করা হল। পুরস্কার বণ্টন করা হল। কয়েদীদের মুক্তি দেওয়া হল। সমস্ত দেশবাসীকে জানাবার জন্য বাদশাহ ছেলের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

উৎসব অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর কামর বাপকে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, এই বিচিত্র ঘোড়া যে বৃদ্ধ শিল্পী তৈরী করেছে সে কোথায়?"

"ওর কথা চিন্তা করাই পাপ। কোন্ কুক্ষণে যে ওকে দেখেছি কে জানে। ওর জন্যই আমি তোমাকে হারালাম। অন্য সমস্ত কয়েদীদের তো ছেড়ে দিয়েছি। তবে, তাকে ছাড়া হয়নি। ওকে রাখা হয়েছে এক অন্ধকার কক্ষে!" বাদশাহ সাবুর বললেন।

কামরের অনুরোধে বাদশাহ পারশ্যের ঐ পণ্ডিতকে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে দিলেন। ভাল পোশাক পরিয়ে, উপহার দিয়ে তাকে বিদেয় করা হল। তার সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে বাদশাহ কোন

ক্রমেই রাজী হলেন না। বাদশাহ ছেলেকে ঐ ঘোড়ায় চড়তে বলাই অনুচিত হয়েছে ভাবলেন। এখন ছেলে কোন্ কল টিপলে ঘোড়া উড়বে আর কোন্ কল টিপলে থেমে যাবে সব জেনে গেছে।

ঐ ঘোড়া বাদশাহের হয়েছে এক আপদ। ছেলেকে বললেন, "বাবা, আর কোনদিন ঐ সর্বনেশে ঘোড়ায় তুমি চড়ো না। ঐ ঘোড়ায় কোথায় যে কোন্ কলকাঠি আছে তা তোমার হয়ত জানা নেই। কখন যে কোন্ কল ঝট করে টিপে দেবে আর কোন্ বিপদ ঘটে যাবে তা বলা যায় না।"

কিন্তু কামর-অল-আকমরের পক্ষে বাপের এই উপদেশ পালন করা সম্ভব হয়নি। কারণ, মুহূর্তের জন্যও সে সনা নগরের কথা ভুলতে পারেনি। পারশ্যের আনাচে কানাচে উৎসব হচ্ছিল কামর ফিরে আসার আনন্দে আর কামর ভাবছিল সনা নগরের বাদশাহের কন্যার কথা। কোন এক গীতিকার মধুর স্বরে বিরহের গান গাইছিল। ঐ গান কানে যেতেই কামরের মন তোলপাড় করে উঠল। কামর সোজা সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গেল। সোজা ঐ কাঠের ঘোড়ায় চড়ে কল টিপে দিল। পরক্ষণেই ঘোড়া পাখির মত আকাশের বুকে উড়তে লাগল।

পরের দিন সকালে উঠে বাদশাহ কামরের খোঁজ পেলেন না। রাজমহলের ছাদে ঘোড়াও ছিল না। বাদশাহ আবার অনুশোচনায় অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলেন। বার বার মনে মনে বলতে লাগলেন, কেন যে ঘোড়াটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেললাম না। ঠিক করলেন, এবার হাতের কাছে ঘোড়াটাকে পেলে একেবারে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবেন। ভাবতে ভাবতে বাদশাহ আবার দুঃখের অতল সাগরে ডুবে গেলেন।

(আরও আছে)
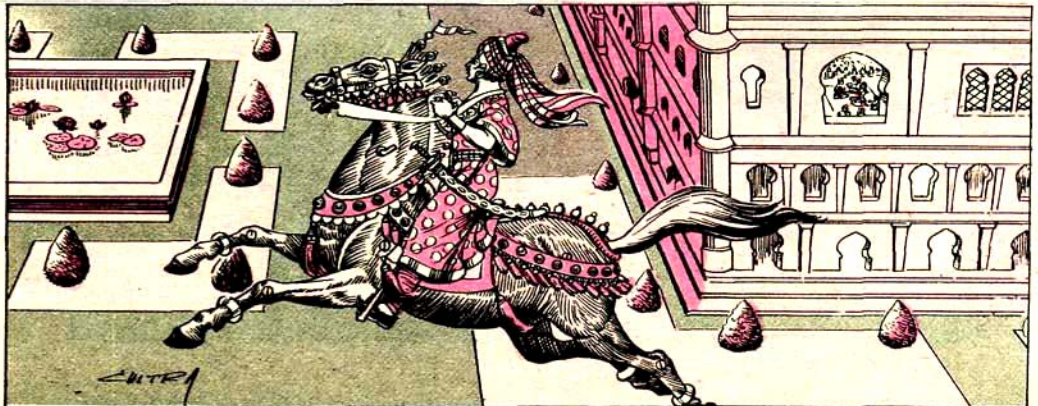
ইংরেজের বুদ্ধি

একজন ডচ, একজন ফরাসী ও একজন ইংরেজের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। ওরা তিনজনে মিলে একবার ওদের এক বন্ধুর কাছে গেল। বন্ধু রোগ শয্যায়: শয্যাশায়ী লোকটি তিন বন্ধুকে এক সঙ্গে দেখতে পেয়ে খুব খুশী হল। বন্ধুদের কাছে সে তার শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করল, "আমি মরে গেলে তোমরা আমার শব-বাক্সে পাঁচ পাউণ্ড করে অর্থ ফেলে দিয়ো। এতে আমি খুব আনন্দ পাব।"

বন্ধুটি মারা গেল। ডচ দেশের বন্ধুটি শব-বাক্সে পাঁচ পাউণ্ড এনে রেখে দিল। ফরাসী দেশের বন্ধুটি ভাবল, মরা বন্ধুকে পাঁচ পাউণ্ডের চেক কেটে দিলে কোন দিনই ঐ চেক আর ভাঙ্গানো হবে না। একথা ভেবে সে একটি চেক শব-বাক্সে রেখে দিল। ইংরেজ ঝট করে পকেট থেকে চেক বই বের করে পনর পাউণ্ডের চেক লিখে শব-বাক্সে রেখে মুহূর্তে ঐ পাঁচ পাউণ্ড ও পাঁচ পাউণ্ডের চেক তুলে নিয়ে পকেটে পুরে নিল।
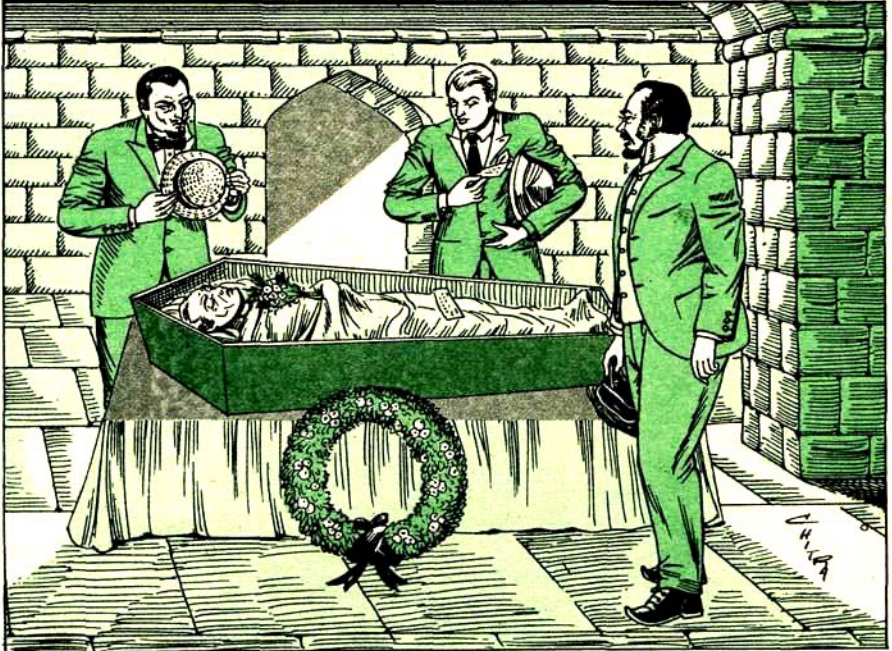
ফাটল

সোনার প্রতিমা গ্রামে বীরবাহু নামে এক কিষাণ ছিল। তার ছিল চার একর জমি। সে দিন রাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলাত। তাতেই নিজের সংসার চালাত।

সে-বছর বৃষ্টি হয়নি। আকালের বছরে চোরের উপদ্রব বাড়ল। পরের বছর বৃষ্টি হল। ক্ষেতে ক্ষেতে ফসলের বাহার।

বীরবাহুর ক্ষেতেও ফসলের বাহার। আগের বছর যারা চুরি করেছিল তারা অত সহজে অভ্যাস ছাড়তে পারল না। তাই বীরবাহু রাত্রে নিজের ক্ষেত পাহারা দিত। সে রাত্রে খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল। বীরবাহু আর জাগতে পারল না। ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে তার ঘুম ছুটে গেল। কানে গেল খস্ খস্ আওয়াজ। বুঝল ক্ষেতে চোর ঢুকেছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে হাতে লাঠি নিয়ে ক্ষেতে ঢুকল।

কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ্য করল কয়েকজন তার ক্ষেতের ফসল কাটছে। জ্যোৎস্না রাত। বীরবাহু ওদের চিনতে পারল। ওরা তার গ্রামেরই চোর। একা চারজন চোরকে ধরতে গেলে মারা পড়তে হবে ভেবে সে একটা উপায় ঠিক করল।

যারা ফসল কাটছে তাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, একজন বেনে, একজন ক্ষত্রিয় আর একজন চাষী।

বীরবাহু প্রথমে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে তাকে প্রণাম করে বলল, "হে ব্রাহ্মণ, আপনি দেবতার সমান। আপনার কোন দরকার ছিল না এত রাত্রে এভাবে ফসল কেটে নিয়ে যাবার। আমাকে হুকুম

কমল বসু
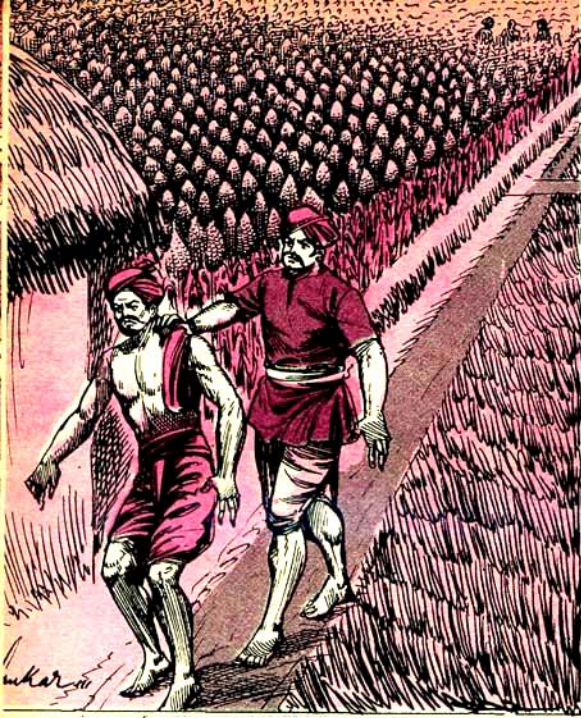
করলেই পারতেন। সোজা আপনার বাড়িতে ফসল কেটে পৌঁছে দিতাম। এখন আপনি এসেছেন যখন, যত ইচ্ছা ফসল কেটে নিয়ে যান। এই যত ফসল দেখছেন সবই আপনার আশীর্বাদের ফলে হয়েছে।"

কিষানের কথা শুনে ব্রাহ্মণ আনন্দে আরও বেশি করে ফসল কাটতে লাগল।

তারপর বীরবাহু ক্ষত্রিয় চোরের কাছে গিয়ে বলল, "হে ক্ষত্রিয়, আপনি রাজা লোক, এই সমস্ত ক্ষেত তো আপনারই। আমি আপনার প্রজা মাত্র। আপনার যত ইচ্ছা ফসল কেটে নিয়ে যান।"

ক্ষত্রিয় বেশি করে ফসল কাটতে লাগল। বীরবাহু বেনের কাছে গিয়ে বলল, "আজ্ঞে বিপদে পড়লেই আপনার কাছে ছুটে গিয়ে ধার করে আনি। আপনি যত চান ফসল কেটে নিয়ে যান। কেউ বাধা দেবে না।

বীরবাহু তারপর কিষাণের কাছে গিয়ে বলল, "আরে ভাই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বেনেকে তো দান দিতে হয়, কর দিতে হয়, ধার করতে হয়, সুদ দিতে হয় কিন্তু তুমি কিনা আমারই মত এক কিষাণ হয়ে এক কিষাণের ক্ষেতের ধান চুরি করতে এসেছ? চল আমার মা ডাকছে। বিচার হবে।" এ কথা বলে ঐ কিষাণকে বীরবাহু টানতে টানতে নিয়ে গেল কুঠিরে। বাকি যারা ক্ষেতে ছিল তারা ভাবল কিষাণের কোন অধিকার ছিল না তাই তাকে ধরে নিয়ে গেল। ওরা কিষাণকে সাহায্য করল না।

বীরবাহু কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বলল, "মশাই আমার মা বলেছে, ব্রাহ্মণের উচিত কেউ দান করলে নেওয়া। চুরি করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। চলুন আমার মায়ের কাছে। তিনি বিচার করবেন।" বীরবাহু তার হাত ধরে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার বীরবাহু ফিরে এল। তখনও বাকি দুজন ফসল কাটছে আপন মনে। এবার সে বেনের হাত ধরে টানতে টানতে বলল, "ওহে মহাজন, আমার মার কাছে জানলাম তুমি নাকি

আমাদের কোনদিন ধার দেওনি। চল আমার মার কাছে। তিনি তোমার বিচার করবেন।" বীরবাহু তাকে নিয়ে গেল।

বেনে ক্ষত্রিয়ের দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন তার কাছে সে সাহায্য চায়। সে যেন তাকে ছাড়িয়ে নেয়।

বেনেকে রেখেই কিষাণ আবার লাঠি হাতে ক্ষেতে গেল। তাকে দেখেই ক্ষত্রিয় যত ফসল নিতে পারল তুলে নিয়ে ছুটে পালাতে লাগল।

বীরবাহুও ছাড়ার পাত্র নয়। সেও ধাওয়া করল তাকে। দূর থেকে তাক করে লাঠি ছুঁড়ে মারল। ক্ষত্রিয় পায়ে চোট পেয়ে পড়ে গেল। তার পর তার কাছে গিয়ে বীরবাহু বলল, "এবার যাবে কোথায়? উঁ? তোমার কাজ লোকের জিনিস যাতে চুরি না যায় তা লক্ষ্য রাখা আর তুমি কিনা নিজেই চুরি করছ। হারামী। চালাকি পেয়েছ!" বলে তাকে মারতে লাগল।

ক্ষত্রিয় মার খেতে খেতে বলল, "আমাকেও তোমার মার কাছে নিয়ে যাওনা ভাই। তোমার মা নিশ্চয় ঐ কিষাণ, ঐ ব্রাহ্মণ আর ঐ বেনেকে ছেড়ে দিয়েছেন। আমাকেও নিয়ে যাওনা ভাই। কেন মারছ।"

"আগে তোমাকে ভাল করে বাঁধি। তারপর টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ওদের যেখানে রেখেছি সেখানে ফেলে রাখব। পরের কথা পরে।" বীরবাহু বলল।

"তোমার মার কাছে নিয়ে চল না ভাই। বিচার হবে।" ক্ষত্রিয় বলল।

"আমার মা হচ্ছে আমার এই জমি। এই মাটি। এই মাটিই আমার মা।" বীরবাহু বলল।

তার পর ওদের সবাইকে এক জায়গায় বেঁধে ফেলে রেখে বীরবাহু ডাকাডাকি করে গ্রামের লোককে জড় করল। ওরা সবাই মিলে উত্তম মধ্যম লাগিয়ে চোরদের পুলিসের হাতে দিল।

বাজে খরচ

বেশ কিছুদিন আগের কথা। সুন্দর নগর নামক এক ছোট্ট শহরে রাম সাহা নামে এক ধনী লোক ছিল। বাড়ির কোন কাজেও টাকা খরচ করতে তার মন চাইত না। খরচের নামে তার জ্বর আসত।

একদিন রাম সাহা কোন একটা কাজে পাশের গ্রামে যাচ্ছিল। পথে তার নজরে পড়ল একটা খেজুর গাছ। গাছে খেজুর ভরে ছিল। রাম সাহা বাচ্চা বয়স থেকেই খেজুর খেতে ভালবাসত। অত খেজুর একটি গাছে দেখে রাম সাহার জিভে জল এল। কিন্তু সে গাছে উঠতে পারত না। আবার খেজুর গাছ থেকে তার পা সরছিল না। শেষে এক পা এক পা করে কোন রকমে ধরে ধরে গাছে উঠতে লাগল। খেজুরের দিকে রয়েছে চোখ আর মন। তাই কোন রকমে উঠে গেল খেজুর গাছের মাথায়।

রাম সাহা যত পারল পেট পুরে খেজুর খেল। তাতেও অত খেজুর গাছে রেখে তার নাবতে ইচ্ছে করছিল না। আরও কিছু খেজুর পেড়ে পকেটে ভর্তি করে পুরে নিল। তারপর নাবতে গিয়ে একবার নিচের দিকে তাকাতেই তার মাথা ঘুরে গেল। মাথা ঘুরতেই ভীষণ ভয় করল তার। প্রতি মুহূর্ত মনে হল এই বুঝি পড়ে যাবে। বলল, "হে ভগবান, আমি মঙ্গল মত নাবতে পারলে তোমার নাম করে এক হাজার লোককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াব।"

মানত করার পর তার সাহস যেন বেড়ে গেল। সে নাবতে লাগল। মাথা ঘোরা কমে গেল। অর্দ্ধেক নাবার পর সে নিচের

রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দিকে তাকাল। তার মনে হল বিপদ অনেকখানি কেটে গেছে। সে মনে মনে ভাবল, পাঁচশো খাওয়ালেই যথেষ্ট। যত মানত হবে ঠিক তত জনকেই যে খাওয়াতে হবে এমন কোন বিধান নেই।

আরও কিছুটা নাবার পর রাম সাহার মনে হল পাঁচশো লোককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর কোন মানে হয় না। একশো জনই যথেষ্ট। শেষ পর্যন্ত সে নিচে নেবে গেল। নেবেই বলল, একশো আজে বাজে লোককে নিমন্ত্রণ করা, এক সৎ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা সমান।

বাড়িতে ফিরে রাম সাহা ভাবতে লাগল কোন্ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা যায়। কোন মোটা ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রন করা উচিত হবে না। তার বাড়ির পূজারী শিবশাস্ত্রী খুব রোগা লোক। নিশ্চয় কম খাবে। সাত পাঁচ ভেবে রাম সাহা ঠিক করল শিবশাস্ত্রীকেই নিমন্ত্রণ করা হবে। সোজা সে শিবশাস্ত্রীর বাড়ি গিয়ে তাকে পরের দিন তার বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে এল।

হাড় কেপ্পন লোক হিসেবে কুখ্যাত রাম সাহার নিমন্ত্রণ পেয়ে শিবশাস্ত্রী তৎক্ষণাৎ সেই মূল্যবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল।

রাম সাহা বাড়ি ফিরে বউকে পথের সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বলল, "আজ আমি যে কাজে গিয়েছিলাম সে কাজ পুরোপুরি হয়নি। কাল আবার যেতে হবে। শিবশাস্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে এসেছি। সমস্ত ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। খরচ যাতে বেশি না হয় সেদিকে ভালভাবে নজর রেখো।"

পরের দিন সকালে রাম সাহা নিজের কাজে পাশের গাঁয়ে চলে গেল।

দুপুরে শিবশাস্ত্রী ঠিক খাওয়ার সময় হাজির হল। রাম সাহার বউ তাকে খেতে বসাল। শিবশাস্ত্রী রোগা হলেও খেতে পারে খুব। সে একাই তিনজনের খাবার দিব্যি খেয়ে উঠল। মিষ্টি যত পারল খেল বাকিগুলো বেঁধে নিল। বাকি রইল দক্ষিণা।

"নিমন্ত্রণ করলে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাও দিতে হয়। অন্তত দুটো সোনার মুদ্রা দেওয়া উচিত।" শিবশাস্ত্রী বলল।

বাধ্য হয়ে দুটো সোনার মুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে রাম সাহার বউ ব্রাহ্মণ বিদায় করল।

তার পরের দিন রাম সাহা বাড়ি ফিরল। তার বউ ব্রাহ্মণ কত খেল, কত দক্ষিণা নিল সব জানাল। সমস্ত ব্যাপার শুনে রাম সাহার তো চক্ষুস্থির। বুক ধক্ ধক্ করতে লাগল। সে বউকে গালাগাল দিয়ে বলল, "তুমি একটা ইয়ে। মাথায় তোমার কিচ্ছু নেই। তোমাকে বোকা বানিয়ে লোকটা আমাকে ফতুর করে গেছে। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, ব্যাটার মজা দেখাচ্ছি।" বলতে বলতে লাঠি হাতে সে ছুটে গেল শিবশাস্ত্রীর বাড়ি।

শিবশাস্ত্রী আগে ভাগেই অনুমান করেছিল রাম সাহা এত খরচের ব্যাপার কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। তেড়ে আসতে পারে তার বাড়ি। তাই সে শিবশাস্ত্রীর আসায় খবর পেয়েই সটান শুয়ে পড়ল। তার ছেলে আর বউ তার কাছে বসে কান্নাকাটি করতে লাগল।

রাম সাহাকে দেখতে পেয়েই শিবশাস্ত্রীর ছেলে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আপনি আমাদের একি সর্বনাশ করলেন? নিমন্ত্রণ করে বাবাকে শেষে কিনা বিষ খাওয়ালেন! বৈদ্য বলেছে খাবারে বিষ মেশানো ছিল। বিষ বমি করাতে চারটি স্বর্ণমুদ্রা নেবে। আপনি এখনই বিচারকের কাছে চলুন।"

রাম সাহা ভাবল বিচারক বদ্যির খরচ তো চাইবেই উপরন্তু জরিমানাও করবে। রাম সাহা ক্ষমা চেয়ে বলল, "বাবা, ওষুধের খরচ পত্তর আমিই দেব। আর বিচারকের কাছে গিয়ে কাজ নেই।"

শিবশাস্ত্রীর ছেলে রাম সাহার প্রতি বিরক্তির ভাব দেখিয়ে চারটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে বিদায় করল। তার পর থেকে খেজুরের কথা মনে পড়লেই রাম সাহার বুক ধক্ করে ওঠে।
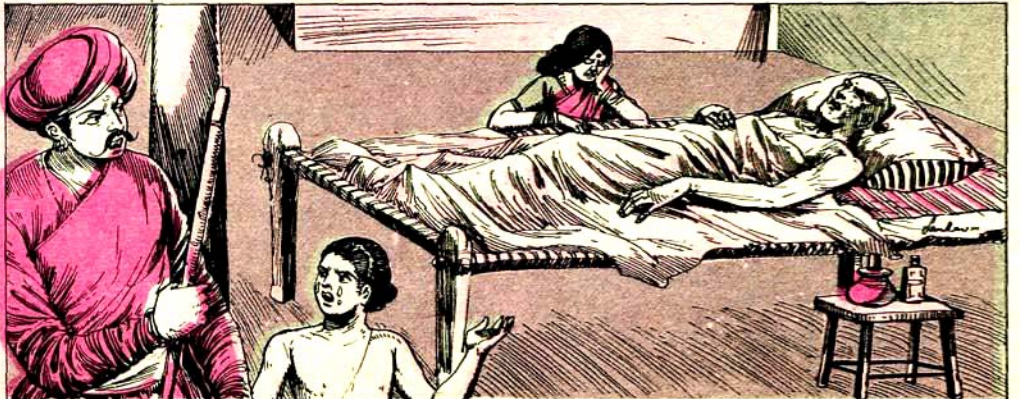
ব্যবসাদারের কাণ্ড

এক শহরে শান্তিলাল নামে এক ব্যবসাদার ছিল। রাজা তাকে ভালবাসতেন। তাই সে রাজার দরবারে প্রত্যেক দিন একবার করে ঘুরে যেত। একদিন রাত্রে ব্যবসাদারটি দেরি করে বাড়ি ফিরল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল ছাদে চোর ঘাপটি মেরে বসে আছে। ব্যবসাদার বউকে হেঁকে বলল, "ওগো শুনছ, শহরে চোরের উপদ্রব দেখা দিয়েছে। গহনাগাটি খুলে দাও, বাক্সে রেখে দেব।"

ব্যবসাদারের গিন্নী স্বামীর কথা সত্যি ভেবে সমস্ত গহনা খুলে তার হাতে তুলে দিল। ব্যবসাদার গহনাগুলো বাক্সে রাখতে রাখতে আর্তনাদ করে উঠল, "ওরে বাবারে! মরে গেলাম! কাঁকড়া বিছে কামড়েছে, মরে গেলাম!"

ব্যবসাদারের আর্তনাদে বউ ছুটে এল, প্রতিবেশীরা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে? কি হয়েছে আপনার?"

আমার আর্তনাদ শুনে আপনারা সবাই তো ছুটে এলেন। কিন্তু কোই ছাদের লোকটাকে তো দেখছি না। দেখুন তো ঐ ছাদের লোকটা নেবেছে কিনা!" ব্যবসাদার বলল। তারপর সবাই ছাদে গিয়ে চোর ধরে রাম ধোলাই দিল।
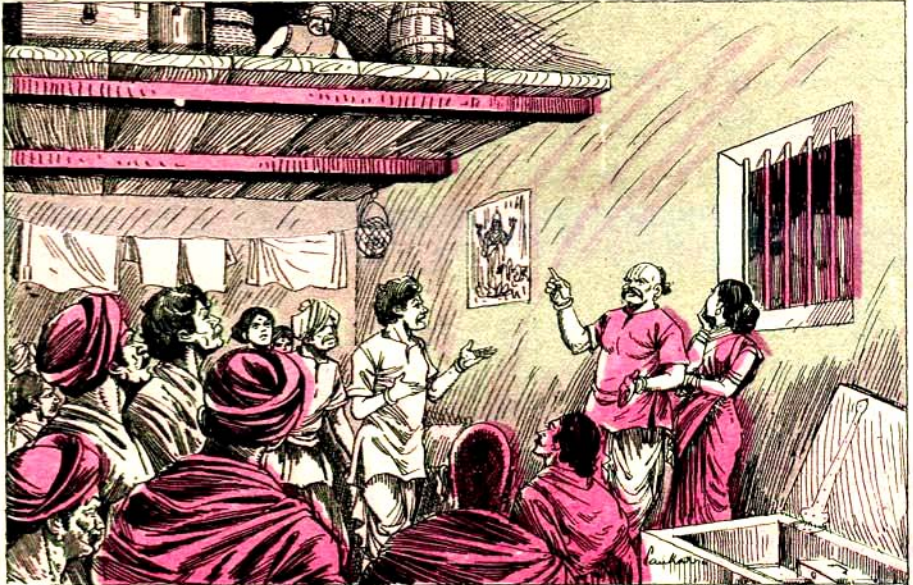
ধূর্ত মন্ত্রী

ধর্মপুর গ্রামে এক জহুরী ছিল। লোকটা ছিল সুবিবেচক ও সত্যবাদী। তাই তার সাথে ব্যবসা করে কেউ কোনদিন ঠকেনি। তার বিরুদ্ধে কারও কোনো নালিশ ছিল না। তার প্রতি সকলের বিশ্বাস ছিল।

একদিন এক ভদ্রলোক জহুরীর হাতে একটা হীরার মালা দিয়ে সেটাকে পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রি করতে অনুরোধ করল। জহুরী তার কথায় রাজী হল।

জহুরীর দোকানে যত খদ্দের যেত প্রত্যেককে সে ঐ হীরের মালা দেখাত। জহুরী এই ভাবে মালাটি বিক্রি করার অনেক চেষ্টা করল।

একদিন শেখর নামে এক মন্ত্রী জহুরীর কাছে কোন এক কাজে এসে ছিল। মন্ত্রী হীরার মালা দেখে মনে মনে কী এক মতলব এঁটে খুব খুশী হয়ে বলল, "এই হার আপনার কাছে এল কি করে?"

জহুরী জানত যে মন্ত্রী মশাই অত্যন্ত শঠ প্রকৃতির লোক। যেমন নীচ তেমনি ধূর্ত, তবু কথার জবাবে কথা বলতেই হয়। তাই সে বলল, "এক ভদ্রলোক এটাকে পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রি করতে আমার কাছে রেখে গেছেন।"

"পাঁচশো সোনার মুদ্রা! অনেক দাম বলছেন তো! চারশো মুদ্রায় হলে আমি এক্ষুনি কিনতাম। পারবেন চারশোতে দিতে?" শেখর বলল।

"তা হতে পারে না। ভদ্রলোক যে পাঁচশো মুদ্রায় বিক্রি করতে বলেছেন!" জহুরী মাথা নেড়ে বলল।

জগন্নাথ মিত্র

"তাহলে আপনাকে একবার আমার বাড়িতে আসতে হবে। স্ত্রীকে মালাটা দেখাতে চাই। স্ত্রীর যদি পছন্দ হয় তবে পাঁচশো মুদ্রাতেই কিনব।" শেখর বলল।

মন্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে জহুরী ঐ হার নিয়ে তার সঙ্গে গেল।

"আপনি হারটা আমার হাতে দিন। এখানে বসুন। আমি ভেতরে গিয়ে স্ত্রীকে দেখিয়ে আসছি।" একথা বলে শেখর জহুরীকে বাইরে বসিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে জহুরীর নাকের ডগায় হঠাৎ দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

"জহুরী ধৈর্য ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রইল। কিন্তু মন্ত্রী আর বেরুনোর নাম করল না। জহুরী দু তিনবার দরজায় টোকা মারল, কড়া নাড়ল কিন্তু দরজা খুলল না। জহুরী বুঝল মন্ত্রী তাকে ধোকা দিয়েছে। জহুরীর মন ভার হয়ে গেল। সে রাত্রে তার ঘুম হল না। কিছুতেই সে ভেবে পাচ্ছিল না যার হার তাকে এ ব্যাপারে কি বলবে।

পরের দিন সকালে জহুরী মন্ত্রীর বাড়ি গেল। মন্ত্রী দরবারে যাওয়ার জন্য বেরুতে যাচ্ছিল এমন সময় জহুরী পৌঁছে তাকে বলল, "হুজুর, আপনি হারের ব্যাপারে কি ঠিক করলেন? আপনি না কিনলে দয়া করে তা ফেরত দিন, আমি অন্য কাউকে
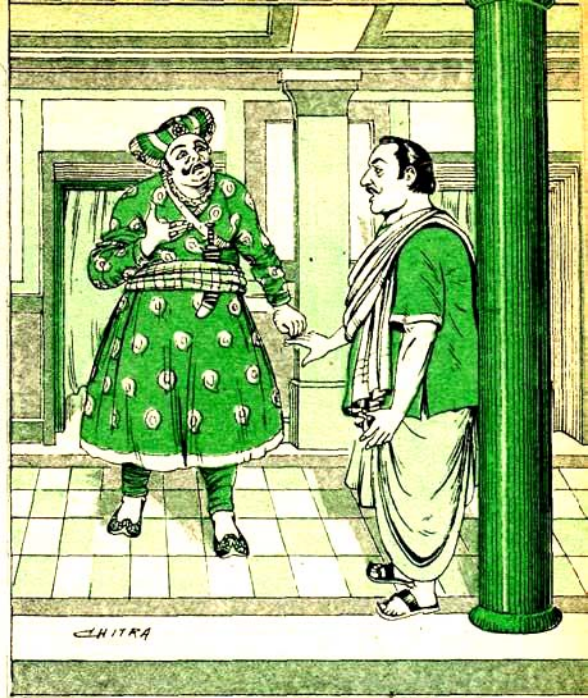
বিক্রি করে যাঁর হার তাঁকে মুদ্রা দিয়ে দেব।" জহুরী বলল।

"কি বলছেন আপনি? পাগল হয়ে যাননি তো! যাক, আর একটি কথা বলেছেন কি একেবারে মজা টের পাইয়ে দেব।" মন্ত্রী ধমক দিয়ে বলল।

জহুরী বুঝল আর ওখানে দাঁড়িয়ে কোন লাভ হবে না। ভাল ভাবেই বুঝতে পারল যে মন্ত্রীর কাছ থেকে সে ঐ হার সহজে আদায় করতে পারবে না। অগত্যা সোজা বিচারকের কাছে গেল। সমস্ত ব্যাপার বিস্তারিত জানাল।

বিচারক ঐ মন্ত্রীকে ভাল ভাবেই চিনত। মন্ত্রী যে ধূর্ত প্রকৃতির তা বিচারকের অজানা

ছিল না। বিচারক জহুরীকে বলল, "ঐ হার আপনার হাতে যাতে দিতে পারি তার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।"

পরের দিন বিচারক নিজের বাড়িতে রাজদরবারের অনেককে খাবার নিমন্ত্রণ করল। ঐ মন্ত্রীকেও ডাকতে ভুলল না। বিচার করতে অসুবিধা হলেই এই ধরণের কোন না কোন বুদ্ধি খাটাত। চারজন এলে চার রকম কথার আদান প্রদান হয়।

আমন্ত্রিত লোকজন আসার আগে বিচারক চাকরকে বলল, "শোন, একটা কথা। মন্ত্রী যখন বাড়িতে ঢুকবে তুমি তৎক্ষণাৎ তার একপাটি জুতো নিয়ে সোজা মন্ত্রীর বাড়ি চলে যাবে। তার স্ত্রীকে বলবে, মন্ত্রী মশাই সবাইকে হীরের হার দেখাতে চাইছেন। আপনি ঐ হার আমার হাতে দিন। তোমাকে অবিশ্বাস করলে ঐ এক পাটি জুতো দেখাবে। তুমি যে আমার বাড়ির চাকর তা ভালভাবে বুঝিয়ে বলবে। আমি নিশ্চিত যে তুমি হার পাবে। তারপর তুমি ঐ হার হাতে করে এখানে অপেক্ষা করবে। তারপর আমি যখন যা বলব তাই করবে।"

অন্যান্যদের সঙ্গে মন্ত্রীও সময় মত হাজির হল। পরক্ষণেই চাকর এক পাটি জুতো নিয়ে বিচারকের কথা মত সব কাজ ঠিকমত করল।

ঐ মন্ত্রীসহ সমস্ত অতিথিদের উপস্থিত থাকার সময় বিচারক চাকরের কাছ থেকে ঐ হার নিয়ে জহুরীকে কাছে ডেকে তার হাতে হার দিতে দিতে বললেন, "ধোকা দিয়ে যেভাবে আপনার হাত থেকে হার নিয়ে গিয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই ধোকা দিয়ে হারটাকে আবার আনা হয়েছে। নিন।"

হীরার হার হাতে পড়তেই জহুরীর ধড়ে প্রাণ এল। বিচারকের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে খুশী মনে সে বাড়ি ফিরে গেল।
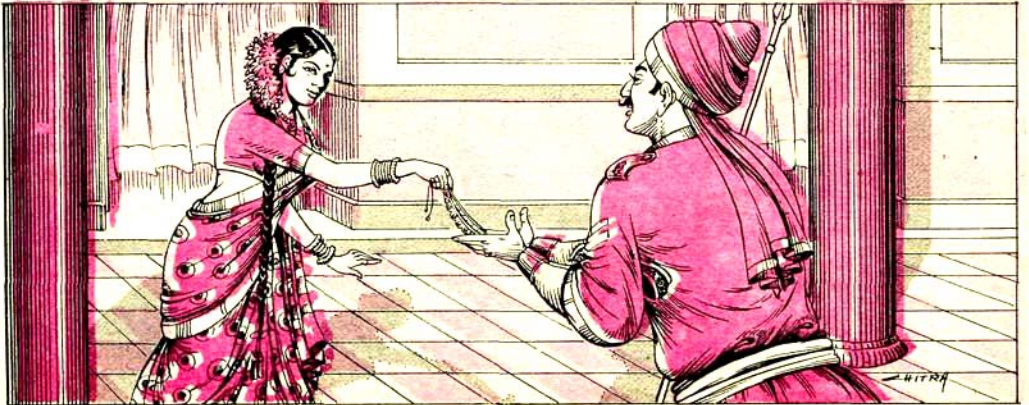
মহাভারত

ধৃতরাষ্ট্র যখন খবর পেলেন যে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে আসছেন তখন তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, সঞ্জয়, বিদুর, দুর্যোধন ও তাঁর মন্ত্রীদের ডেকে পাঠালেন। তিনি তাদের বললেন, "শুনেছি কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে আস-ছেন! এ সংবাদ পেয়ে নগরবাসীর মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পথে পথে তাঁর আগমনের সমস্ত রকমের সুব্যবস্থা করতে হবে। নানা ভাবে তাঁর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে হবে।"

দুর্যোধন হস্তিনাপুর থেকে বৃকস্থল পর্যন্ত সারা পথ সাজানোর ব্যবস্থা করলেন।

সেই মনোহর রূপসজ্জা দেখতে দেখতে কৃষ্ণ হস্তিনাপুর পোঁছালেন। সবাই কৃষ্ণকে স্বাগত জানাতে রথে চড়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁদের প্রত্যেকের মনে দ্বিধা আছে, আছে দ্বন্দ্ব। কৃষ্ণ যে কেন আসছেন তা কেউ সঠিক জানেন না।

প্রাতঃকালে কৃষ্ণ বৃকস্থল ত্যাগ করে হস্তিনাপুরে এলেন। দুর্যোধনের ভ্রাতারা এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি এগিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করলেন। রাজপথে বহু লোক কৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগল। বর-নারীগণ উপর থেকে দেখতে লাগলেন, তাঁদের চাপে অতি সুবৃহৎ অট্টালিকাও যেন স্থানচ্যুত হল। তিন মহল অতিক্রম করে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রাদি সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা করলেন।

কৃষ্ণের দৌত্য
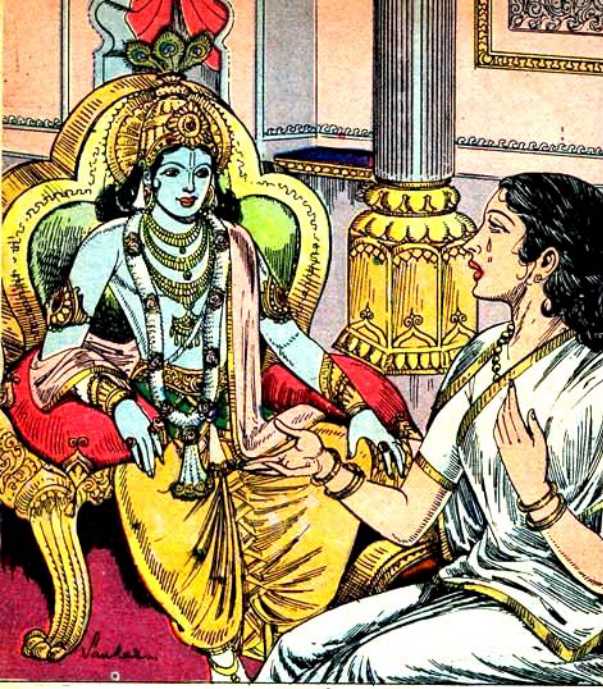
পুরোহিতগণ যথাবিধি গো মধুপর্ক ও জল দিয়ে কৃষ্ণের বরণ করলেন। কিছুক্ষণ পর বিদুরের ভবনে গেলেন এবং অপরাহ্নে পিতৃস্বসা কুন্তীর সঙ্গে দেখা করলেন।

কৃষ্ণের গলা জড়িয়ে ধরে কুন্তী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "বৎস, আমার ছেলেরা ছেলেবেলাতেই পিতৃহীন হয়েছিল। আমিই তাদের পালন করেছিলাম। পূর্বে যারা বহু ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করত তারা কি করে বনবাসের অত কষ্ট সহ্য করল? ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ও মহাবল ভীমার্জুন কেমন আছে? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বশবর্তী আমার সেবাকারী বীর সহদেব কেমন আছে? যাকে আমি নিমেষমাত্র না দেখে থাকতে পারতাম না সেই নকুল কেমন আছে? যিনি আমার সকল পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, যিনি কৌরবসভায় লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, সেই কল্যাণী দ্রোপদী কেমন আছেন। আমি দুর্যোধনের দোষ দিচ্ছি না নিজের পিতারই নিন্দা করি।"

কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, আপনার মত মহীয়সী কে আছেন? আপনি বীরপত্নী, বীরজননী। খুব শীঘ্রই পুত্রদের নীরোগ কৃতকার্য হতশত্রু রাজশ্রী সমন্বিত ও পৃথিবীর অধিপতি দেখবেন। এই বলে কুন্তীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ দুর্যোধনের গৃহে গেলেন। সেখানে দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি এবং নানা দেশের রাজারা ছিলেন। সম্বর্ধনার পর কৃষ্ণ আসন গ্রহণান্তে দুর্যোধন তাঁকে ভোজনের অনুরোধ করলেন। কিন্তু কৃষ্ণ রাজী হলেন না।

দুর্যোধন বললেন, "জনার্দন, তোমার জন্য যে খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ও শয্যার আয়োজন করা হয়েছে তা তুমি নিলে না কেন? তুমি কুরুপাণ্ডব দুই পক্ষেরই হিতাকাঙ্খী ও আত্মীয়। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয়, তবুও আমাদের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করলে, এর কারণ কি?"

কৃষ্ণ তাঁর বিশাল বাহু তুলে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন, "ভরতবংশধর, দূত সফল হলেই তবে ভোজন ও পূজা গ্রহণ করে।"

দুর্যোধন বললেন, "এমন কথা বলা তোমার উচিত নয়। তুমি সফল হও বা না হও আমরা তোমাকে পূজা করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে আছি, তোমার সাথে আমাদের শত্রুতা বা বিবাদ নেই। তবে তুমি আপত্তি করছ কেন?"

কৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন, সম্প্রীতি থাকলে অথবা বিপদে পড়লে পরের অন্ন খাওয়া যায়। রাজা, তুমি আমাদের উপর সন্তুষ্ট নও, আমি বিপদেও পড়ি নি। শত্রুর অন্ন খাওয়া উচিত নয়, তাকে অন্ন দেওয়াও উচিত নয়। তুমি পাণ্ডবদের হিংসা কর, কিন্তু তাঁরা আমার প্রাণস্বরূপ।

যে পাণ্ডবদের সাথে শত্রুতা করে সে আমারও শত্রু, যে তাঁদের বিরুদ্ধে সে আমারও বিরুদ্ধে। দুরভিসন্ধির জন্য তোমার অন্ন দূষিত, তা আমার গ্রহণীয় নয়। আমি একমাত্র বিদুরের অন্নই খেতে পারি।" কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে চলে গেলেন।

বিদুর নানাবিধ পবিত্র ও উপাদেয় খাদ্য ও পানীয় এনে বললেন, "গোবিন্দ, এতেই তুষ্ট হও, তোমার যোগ্য সমাদর কে করতে পারে?"

ব্রাহ্মণগণকে নিবেদন করে কৃষ্ণ অনুচর-সহ বিদুরের অন্ন ভোজন করলেন।

রাত্রিকালে বিদুর বললেন, "কেশব, এখানে আসা তোমার উচিত হয়নি। দুর্যোধন অধার্মিক, ক্রোধী, দুর্বিনিত ও মূর্খ। সে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতির ভরসায় এবং বহু সৈন্য সংগ্রহ করে নিজেকে অজেয় মনে করে। যার হিতাহিত জ্ঞান নেই তাকে কিছু বলা বধিরের নিকট গান গাওয়ার সমান। দুর্যোধন তোমার কথা গ্রাহ্য করবে না। নানা দেশের রাজারা সসৈন্যে কৌরবদলে যোগ দিয়েছেন। যাঁদের সাথে পূর্বে তোমার শত্রুতা ছিল, যাঁদের ধন তুমি হরণ করেছ, তাঁরা সকলেই এখানে এসেছেন। কৌরব-সভায় এই সকল শত্রুদের মধ্যে কি করে তুমি যাবে? মাধব, পাণ্ডবদের উপর আমার যে প্রীতি আছে তারও অধিক প্রীতি তোমার উপর আছে, সেজন্যই এ-কথা বলছি।"

কৃষ্ণ বললেন, "আপনার কথা মহা-পণ্ডিত, বিচক্ষণ এবং পিতামাতার মত হিতৈষী ব্যক্তিরই উপযুক্ত। আমি দুর্যোধনের দুষ্ট স্বভাব এবং তার অনুগত রাজাদের শত্রুতা জেনেও এখানে এসেছি। মৃত্যু কবল থেকে পৃথিবীকে যে মুক্ত করতে পারে সে মহান ধর্মলাভ করে। মানুষ যদি ধর্মকার্যে সাধ্যমত যত্ন করে তবে সম্পন্ন করতে না পারলেও তার পুণ্য হয়। আমি কুরু ও পাণ্ডবের মধ্যে শান্তি স্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করব যাতে তাঁরা যুদ্ধে বিনষ্ট না হয়।"

পরদিন ভোরবেলা সুকণ্ঠ সুতমাগধগণের বন্দনার এবং শাঁখ ও দুন্দুভির শব্দে কৃষ্ণের ঘুম ভাঙ্গল। তাঁর প্রাতঃকৃত্য শেষ হলে দুর্যোধন ও শকুনি তাঁর কাছে এসে বললেন, "রাজা, ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম প্রভৃতি তোমার প্রতীক্ষা করছেন।"

কৃষ্ণ অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং কৌস্তুভ মণি ধারণ করে বিদুরকে নিয়ে রথে উঠলেন। দুর্যোধন, শকুনি এবং সাত্যকি প্রভৃতি রথে, গজে ও অশ্বে অনুসরণ করলেন। বহু সহস্র অস্ত্রধারী সৈন্য কৃষ্ণের আগে এবং বহু হস্তী ও রথ তাঁর পিছনে গেল। রাজসভার নিকট এসে কৃষ্ণের অনুচরগণ শাঁখ ও বেণুর শব্দে নিনাদিত করলেন। বিদুর ও সাত্যকির হাত ধরে কৃষ্ণ রথ থেকে নাবলেন। তিনি সভায় প্রবেশ করলে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম, দ্রোণাদি এবং সমস্ত রাজাদি সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে সর্বতোভদ্র নামে একটি স্বর্ণভূষিত আসন কৃষ্ণের জন্য রাখা ছিল।

অতসীফুলের মত শ্যামবর্ণ পীতবসনধারী জনার্দন সুবর্ণে গ্রথিত ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় শোভিত হলেন। তাঁর আসন স্পর্শ করে বিদুর একটি মৃগচর্মাবৃত মণিময় আসনে বসলেন। কর্ণ ও দুর্যোধন কৃষ্ণের অদূরে একই আসনে বসলেন। সভা নীরব হল। মেঘগম্ভীর কণ্ঠে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বললেন, "ভরতনন্দন, যাতে কুরু-

Sankar
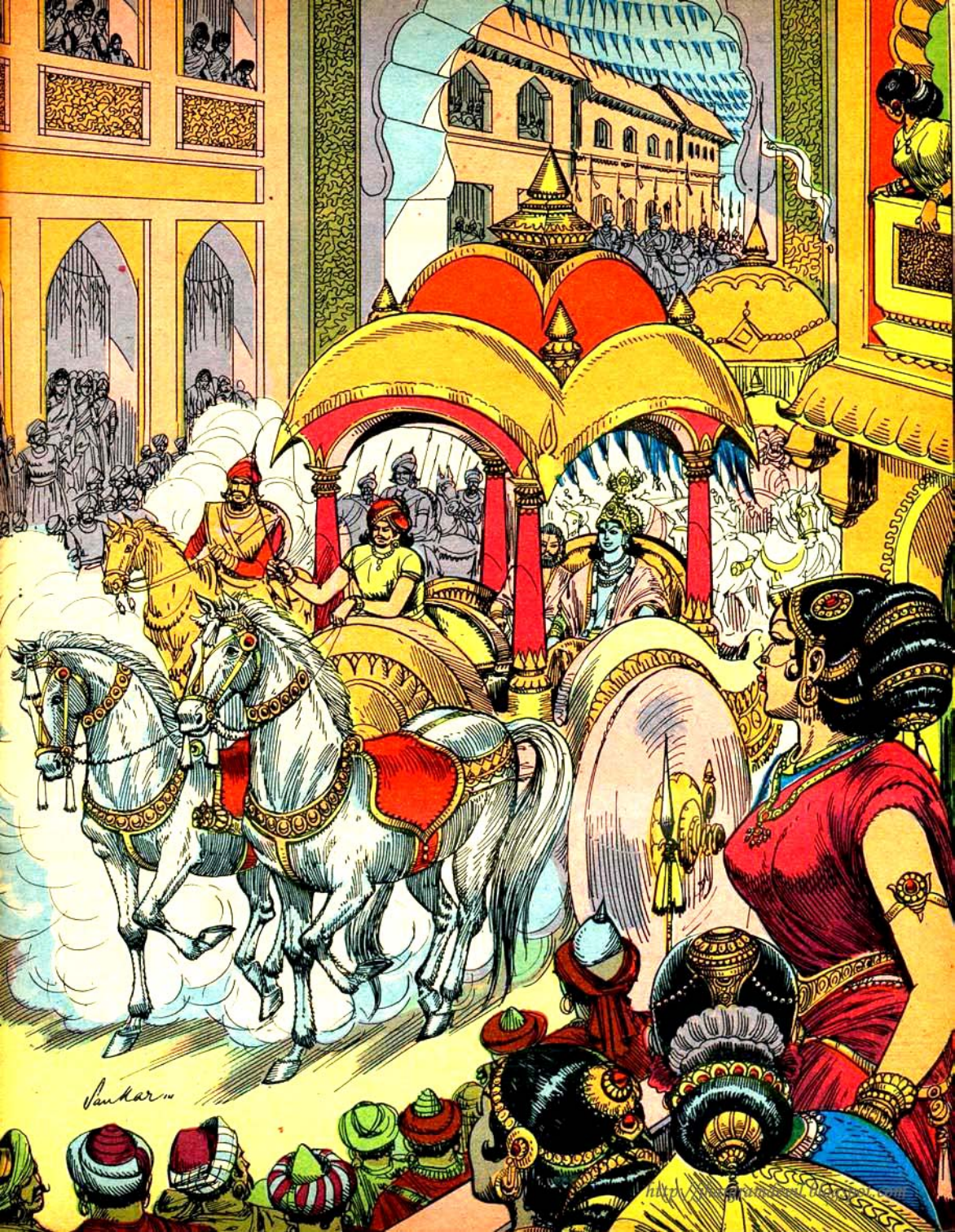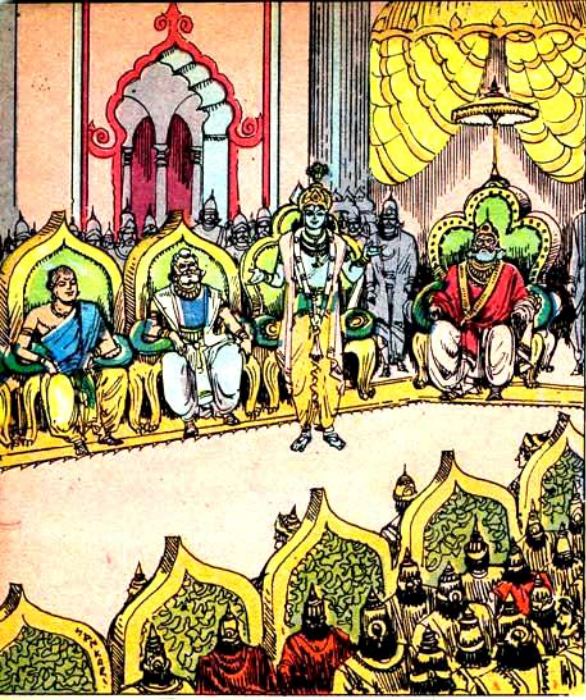
পাণ্ডবদের শান্তি হয় এবং বীরগণের জীবন নষ্ট না হয় তার জন্য আমি প্রার্থনা করতে এসেছি। আপনাদের বংশ সকল রাজ-বংশের শ্রেষ্ঠ, এই মহাবংশে আপনার নিমিত্ত কোন অন্যায় কাজ হওয়া উচিত নয়। দুর্যোধনাদি আপনার পুত্রগণ অশান্ত, জ্ঞানশূণ্য ও লোভী, এঁরা ধর্ম ও অর্থত্যাগ করে নিজের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়দের সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করছেন। কৌরবগণের ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হয়েছে, আপনি যদি অবহেলা করেন তবে পৃথিবী ধ্বংস হবে। আপনি ইচ্ছে করলেই এই দারুণ বিপদ স্তব্ধ করতে পারেন। মহারাজ, যদি পুত্রদের শাসন করেন এবং সন্ধির জন্য যত্নবান হন তবে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হবে। পাণ্ডবগণ যদি আপনার রক্ষক হন তবে স্বয়ং ইন্দ্রও আপনাকে জয় করতে পারবেন না। যে দলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি আছেন সেই দলে যদি পঞ্চপাণ্ডব ও সাত্যকি প্রভৃতি যোগ দেন তবে কোন্ দুর্মতি তাঁদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইবে? কৌরব ও পাণ্ডবগণ মিলিত হলে আপনি অজেয় ও পৃথিবীর অধিপতি হবেন। প্রবল শক্তিশালী রাজারাও আপনার সাথে মিলিত হবেন। পাণ্ডবগণ অথবা আপনার ছেলেরা যুদ্ধে নিহত হলে আপনি কি সুখী হবেন? পৃথিবীর সব রাজারা যুদ্ধের জন্য একত্র হয়েছেন। তাঁরা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সৈন্য ধ্বংস করবেন। মহারাজ, এই সব প্রজাদের আপনি রক্ষা করুন। আপনি ধীর স্থির ভাবে এই সব বিষয় ভেবে দেখলে এরা সবাই বাঁচতে পারবে। এরা অপরাধী নয়, এরা দান করতে ভালবাসে, এদের সলজ্জ ভাব আছে, এদের জন্ম ভাল বংশে এবং এরা সৎ। এরা একে অন্যকে ভালবাসে। এখন এদের রক্ষার ভার আপনার। আর যে সব রাজা এখানে উপস্থিত হয়ে আছেন তাঁদের অনুরোধ করবো রাগ আর বিরোধের ভাব পরিহার করে তাঁরা যেন সানন্দে পান এবং ভোজন সেরে ফিরে যান। পিতৃহীন

পাণ্ডবেরা আপনার কাছেই বড় হয়েছেন। পাণ্ডবদের ইচ্ছে ওঁরা যেন আপনার কাছ থেকে সুবিচার পায়। পাণ্ডবরা, আজ যাঁরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলতে বলেছেন, আপনারা প্রত্যেকে ধর্মজ্ঞ কোন অন্যায় কাজ আপনারা করবেন না। অসত্যকে আমল দেবেন না সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। ধর্ম রক্ষা করবেন। না হলে ধ্বংস অনিবার্য।"

সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন প্রত্যেকে কান খাড়া করে শুনছিলেন। ওদের হাব-ভাব লক্ষ্য করে কৃষ্ণ আবার বললেন, "এখন আপনারাই বলুন, আমি ধর্মসঙ্গত কথা বলছি কিনা, আমার কথায় কোন অর্থহীন শব্দ আছে কিনা? হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, আপনিই বলুন, যুধিষ্ঠির আপনার সঙ্গে কত ধীর স্থির শান্ত ভদ্র ব্যবহার করেছেন। জতুগৃহ দাহের পর তিনি আবার আপনার কাছেই ফিরে এসেছিলেন। আপনিই তাঁকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠিয়ে ছিলেন। সমস্ত রাজাকে তিনি আপনার অধীন করেছিলেন। আপনার মর্যাদা তিনি বাড়িয়েছেন। তার পর শকুনি মায়ার ছলনে ভুলিয়ে তাকে নিঃস্ব করেছেন। তার পরেও যুধিষ্ঠির ধৈর্য ধরেছিলেন। তিনি নিজের চোখে দ্রৌপদীকে নিগ্রহ করা দেখেও ধৈর্য হারাননি। যাই হোক, এখন পাণ্ডবগণ
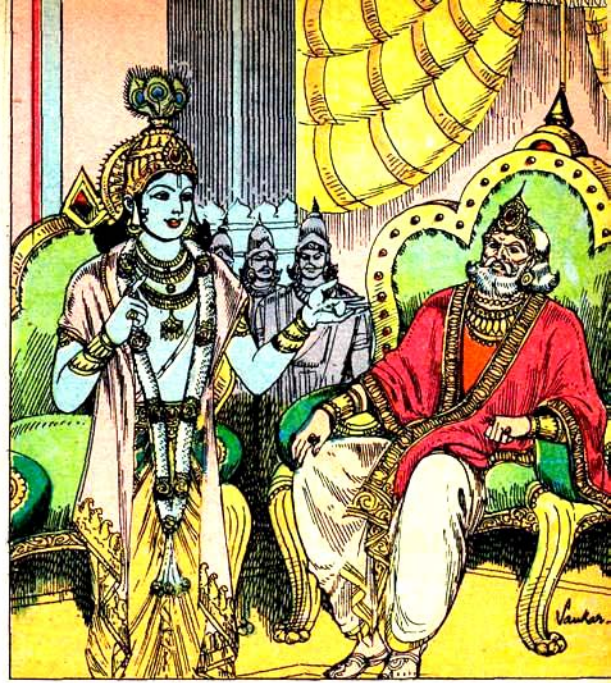
আপনার কাছে সুবিচার চায়। আপনি যা বলবেন তাই ওঁরা করবেন। শেষ পর্যন্ত যদি আপনি তাঁদের যুদ্ধে নামাতে চান সেক্ষেত্রে ওঁরা যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। এখন আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করবেন।"

সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকে কৃষ্ণের যুক্তিপূর্ণ কথা অবাক হয়ে শুনছিলেন। তখন পরশুরাম বললেন: মহারাজ, একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ আপ-নার কাছে নিবেদন করছি। শুনে আপনার ভাল লাগলে সেই মত কাজ করুন।

প্রাচীন কালে দম্ভোদ্‌ভব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সব সময় সবাইকে প্রশ্ন করতেন, "আমার চেয়ে বড় অথবা

আমার সমান যোদ্ধা কি আছে?" বহু ব্রাহ্মণ তাঁকে উপদেশ দিতেন ঐ ভাবে আত্মপ্রচার না করতে। কিন্তু দম্ভোদ্‌ভব তাঁদের উপদেশ কানে তুলতেন না। শেষে একজন তপস্বী রেগে গিয়ে তাঁকে বললেন, "মহারাজ, গন্ধমাদন পর্বতে নর ও নারায়ণ নামে দুজন পুরুষশ্রেষ্ঠ তপস্যা করছেন। তোমার যদি সাহস থাকে তবে তুমি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পার।" দম্ভোদ্‌ভব বহু সৈন্য নিয়ে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে ঐ দুই তাপসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলেন। নর-নারায়ণ দম্ভোদ্‌ভবকে বললেন, "এখানে অস্ত্রের ব্যবহার নেই, কুটিলতা নেই, যুদ্ধ এখানে হয় না তুমি বরং অন্য কোথাও গিয়ে যুদ্ধ করগে। পৃথিবীতে বহু জায়গায় ক্ষত্রিয় আছে।"

দম্ভোদ্‌ভব নর-নারায়ণের কথা শুনলেন না। তখন বাধ্য হয়ে এক মুঠো কাশ ঘাস তাঁর সৈন্যের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। ঐ ঘাস তীক্ষ্ণ তীরের মত দম্ভোদ্‌ভবের সৈন্যদের চোখে কানে নাকে বিঁধতে লাগল। সৈন্যদের আক্রান্ত দেখে দম্ভোদ্‌ভব নরের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন।

তখন ঋষি নর বললেন, "যাও আর কখনও যুদ্ধের নাম করো না। এমন কাজ কর যাতে প্রজাদের মঙ্গল হয়। কার শক্তি যে কতখানি তা না জেনে আক্রমণ করতে যেও না।" তারপর রাজা দম্ভোদ্‌ভব ঋষি নরকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

কাহিনী শেষ করে পরশুরাম ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "হে মহারাজ, ঋষি নরের ক্ষমতাই এই কাহিনীতে প্রকাশ পেয়েছে। ঋষি নারায়ণের ক্ষমতা নরের তুলনায় অনেক বেশি। ঐ নর-নারায়ণই অর্জুন-কৃষ্ণ হয়ে জন্মেছেন। তাই বলছি, যে অর্জুনকে কৃষ্ণ সাহায্য করছেন সেই অর্জুনকে পরাজিত করা অত সহজ নয়। আপনি দয়া করে পাণ্ডবদের সাথে যুদ্ধ না করে সন্ধি করুন।

শিবলীলা

[তিন]

হিমালয়ের কোল ঘেসে দেবদারু গাছের বাহার। গাছের মাথায় মাথায় বরফের আলোকিত শোভা। এই অঞ্চলে সেকালে ভৃগু, মরীচি, অভীরস প্রমুখ ঋষিরা আশ্রম তৈরি করে সপত্নি থাকতেন। তপস্যা ও যজ্ঞ করতেন। তপস্যার ফলে অর্জিত শক্তি সম্পর্কে তাঁদের মনে বেশ অহংকার ছিল। তাঁদের পত্নীরা ছিলেন পতিব্রতা। কোন পুরুষ পতিব্রতাদের ধারে কাছে এলেই ভস্ম হয়ে যায়। এমন কি স্বয়ং ত্রিমূর্তিও তাঁদের সামনে দাঁড়াতে পারবেন না বলে তাঁদের ধারণা ছিল। তাঁদের এই অহংকারের কথা নারদ পার্বতী ও শিবের কানে তুলে দিলেন।

একবার এক মহাযজ্ঞের ব্যাপারে ঋষিগণ স্ত্রীদের রেখে চলে গেলেন। এই সুযোগে শিব সম্মোহন রূপ ধারণ করে এক হাতে সিদ্ধি ও মহুয়ার সুরা পাত্র এবং অন্য হাতে ভিক্ষা পাত্র নিয়ে উন্মত্তের মত চলতে চলতে দারুকাবনে উপস্থিত হলেন। শিবের রূপ দেখে ঋষি পত্নীরা অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। দারুকাবনে শিবের সঙ্গে খেলা করতে লাগলেন। আর গান করতে লাগলেন।

ঠিক তখনই নারদ ঋষিদের কাছে গিয়ে বললেন, "ওদিকে যে এক ভিক্ষুক আপনাদের পরিবারে তোলপার করে ফেলল।" সমস্ত ঋষিরা দারুকাবনে ছুটে গেলেন। সেখানে চাঁদের হাট বসে গেছে। ঋষিরা রেগে গিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুমি?"

"আমার নাম চিদম্বর সুন্দরেশ্বর।" ভিক্ষুকবেশী শিব জবাব দিলেন।

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

"তুমি এখানে কি করছ?" ঋষিরা জিজ্ঞেস করলেন।

শিব সুরাপাত্র ও ভিক্ষাপাত্র তৎক্ষণাৎ দেখিয়ে বললেন, "যার কোন কাজ নেই তাকে কোন না কোন কাজে জরিয়ে রাখা।"

"ব্যাটা তোমার পুরুষত্ব যেন একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়।" ঋষিরা শাপ দিলেন।

"এ আর আমাকে নতুন কথা কি বললে!" শিব বললেন।

ঋষিগণ অভিচার হোম করে তা থেকে 'মায়া' নামে অন্ধকার ছড়ানোর কৃত্যাভূতমে সৃষ্টি করে শিবের উপর চড়াও হতে বলল। সেই মায়াকে শিব ডান পায়ে চেপে রেখে বাঁ পায়ে নাচানাচি করতে লাগলেন।

তারপর ঋষিগণ 'ভয়' নামে এক বাঘকে সৃষ্টি করে শিবের উপর লেলিয়ে দিলেন।

শিব বাঘকে চিরে ফেলে তার চামড়া কোমরে পরে নিলেন।

তারপর ঋষিগণ 'মহাপাপ' নামে এক সাপ শিবের উপর ছুঁড়ে দিলেন।

শিব ঐ সাপকে নিজের ভূষণের মত ব্যবহার করলেন।

তখন ঋষিগণ 'চিত্ত চঞ্চল' নামে এক সম্মোহনকারী বিদ্যাকে মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রয়োগ করলেন শিবের উপর।

শিব তা হরিণের শাবক বানিয়ে নিজের মুঠোর মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন। ঋষিরা ভীষণ রেগে গিয়ে শিবের উপর প্রলয়

কালের অগ্নি ছুঁড়ে মারলেন। শিব ঐ অগ্নিকে ফুলের তোড়ার মত ধরে ফেললেন।

এতেও ঋষিগণ শিবকে চিনতে পারেন নি। তাঁরা 'মহাজ্বালা' সৃষ্টি করে শিবের উপর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু সেই মহা-জ্বালা শিবের চারদিকে তোরণ হয়ে রয়ে গেল।

শিব এইভাবে যখন মায়াকে মর্দন করে নৃত্য করছিলেন তখন তা দেখার জন্য গণেশ, কার্তিক, নন্দী, ভৃঙ্গী প্রমুখদের নিয়ে পার্বতী সেখানে পৌঁছালেন। জগদম্বা পার্বতীর সামনে শিবের নৃত্য দেখতে একে একে সমস্ত দেবতা সেখানে পৌঁছালেন।

বিষ্ণু রাগ সহ মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলেন। সরস্বতী বীণা বাজাতে লাগলেন। ইন্দ্র বাজাতে শুরু করলেন বেণু। ব্রহ্মা নাচের তালে তালে তাল দিতে লাগলেন। ঋষিগণ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সামবেদ পাঠ করতে লাগলেন। নারদ দেবগান্ধারের গান গাইতে লাগলেন। নন্দীশ্বর ভেরী বাজালেন ও কার্তিকেয় তূর্যনাদ করলেন। ভৃঙ্গীশ্বর বাজালেন ডমরু। সেই সময় শিবতাণ্ডব দেখতে দেখতে গণেশের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা দিল। তখন সেও নাচতে শুরু করে দিল। তার দেখাদেখি তার বাহন ইঁদুরও নাচানাচি শুরু করে দিল।

শিবের নৃত্য, বিষ্ণুর রাগ ও ব্রহ্মার লয় দিয়ে জগতলীলা নৃত্যের রূপে শিবলীলা

হতে দেখে ভরত মুনি নটরাজ শিবকে নৃত্যের দেবতা রূপে ভরতশাস্ত্র নামে নাট্য বেদ রচনা করেন।

ব্যাঘ্রপাদ নামধারী এক মুনির উপমন্যু নামে এক পুত্র ছিল। পাঁচ বছর বয়সেই ঐ শিশু বুঝতে পেরেছিল যে ওদের পরিবার দরিদ্র। সে বনে গিয়ে পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র জপ করে শিবের তপস্যা করতে লাগল।

শিব ও পার্বতী বিকৃত রূপ ধারণ করে উপমন্যুর কাছে গিয়ে বললেন, "বাবা, এই বনে বাঘ সিংহ আছে। তুমি বাড়ি ফিরে যাও।"

"শিব পঞ্চাক্ষরী যখন আমার আছে তখন আর কোন ভয় নেই।" উপমন্যু বলল।

এ কথায় পার্বতী ও পরমেশ্বর প্রসন্ন হয়ে তাকে সমস্ত রকমের ঐশ্বর্য দান করল।

গয়াসুর নামে এক দানব তিন লোকে দাপট দেখাতে দেখাতে কৈলাসে গিয়ে পড়ল। তখন শিব নিজের জটাজুট নাড়া দিলেন। তখন তা থেকে ভয়ঙ্কর মুখের এক বিশাল ব্যক্তি সৃষ্টি হয়ে ঐ দানবকে গিলে ফেলতে গেল। তখন গয়াসুর ভয় পেয়ে শিবের শরণাপন্ন হল। শিব তাকে অভয় দান করলেন।

বিরাট মুখের ঐ ব্যক্তি আর্তনাদ করে উঠল, "আমার খাবার চাই। খিদে পেয়েছে।" শিব তাকে আদেশ দিলেন, "তুমি নিজেকেই খেয়ে খিদে মেটাও।" শিবের আদেশে ভয়ঙ্করমুখী নিজের সমস্ত দেহ খেয়ে নিল। বাকি রইল শুধু মুখটা। এই ঘটনায় শিব সন্তুষ্ট হয়ে তার নাম রাখলেন, 'কীর্তিমুখ'। শিব তাকে বরও দিলেন, "ওরে কীর্তিমুখ, তুমি সমস্ত দেবতার মাথায় চড়ে তাদের কীর্তি প্রদান করবে।"

এই ভাবে শিবের অংশ কীর্তিমুখের রূপ ধারণ করে মকর তোরণের মাঝে প্রত্যেক দেবতার মাথায় সুশোভিত হয়।

নয়টি ছত্র

ফ্নোম্‌পেনের (কাম্বোডিয়া) রাজ মহলেস্থিত এই সিংহাসনের মাথায় আছে নয়টি ছত্র। রাজাদের রাজ্যাভিষেক এখানেই হয়! বিদেশের রাজদূত এখানেই রাজার সঙ্গে দেখা করে। এই সিংহাসনের সামনে মহিলারা আসতে পারে না। মহিলাদের জন্য সিংহাসনের পিছনে আলাদা একটি ঘর আছে। এই ঘর থেকে মহিলারা রাজদর্শন করেন।

ফটো ঃ অনন্ত দেশাই
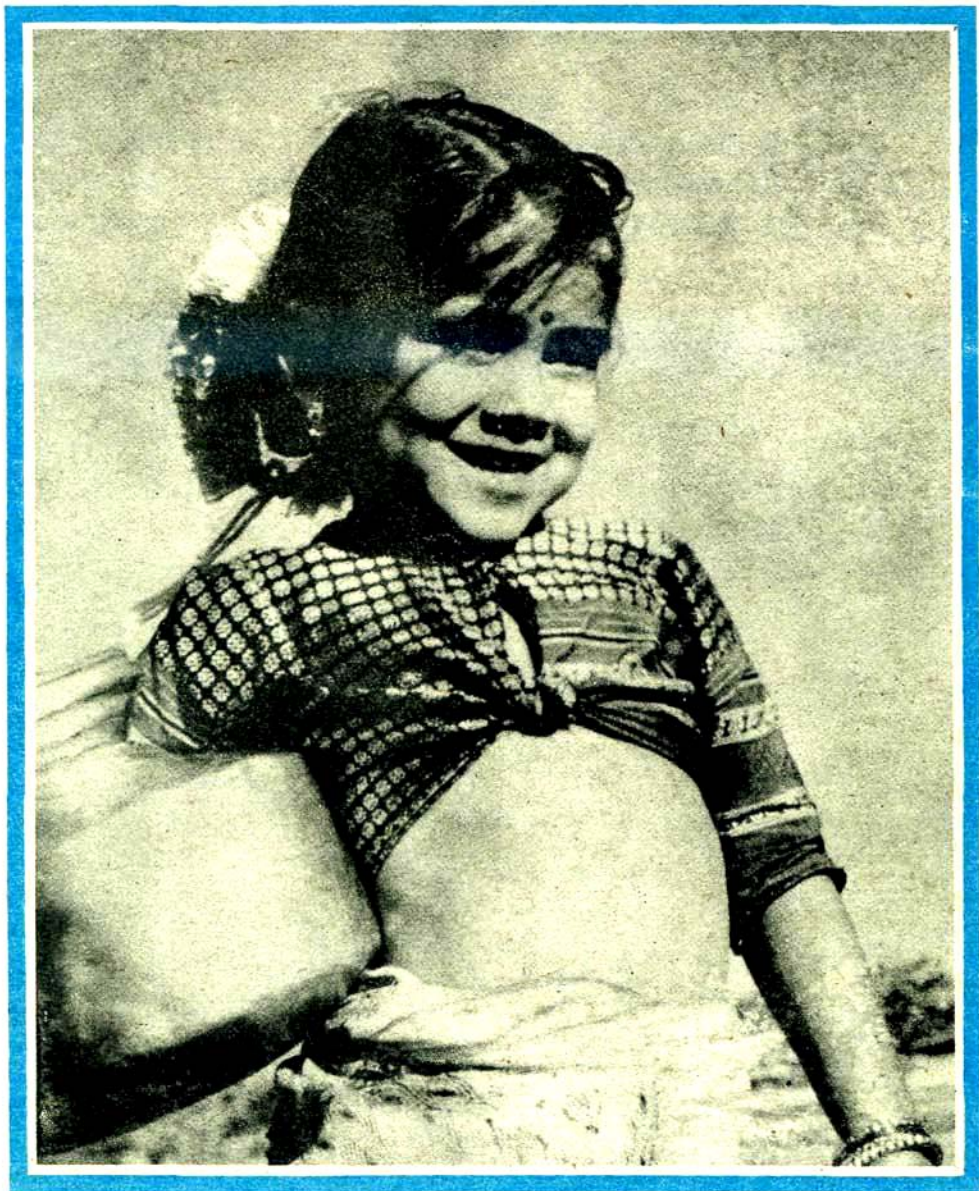
পুরস্কৃত
টীকা

গাগরি ভরিতে চল্‌

পুরস্কার পেলেন
তপতী চট্টোপাধ্যায়

ফটো : ডি. এন. প্রসাদ
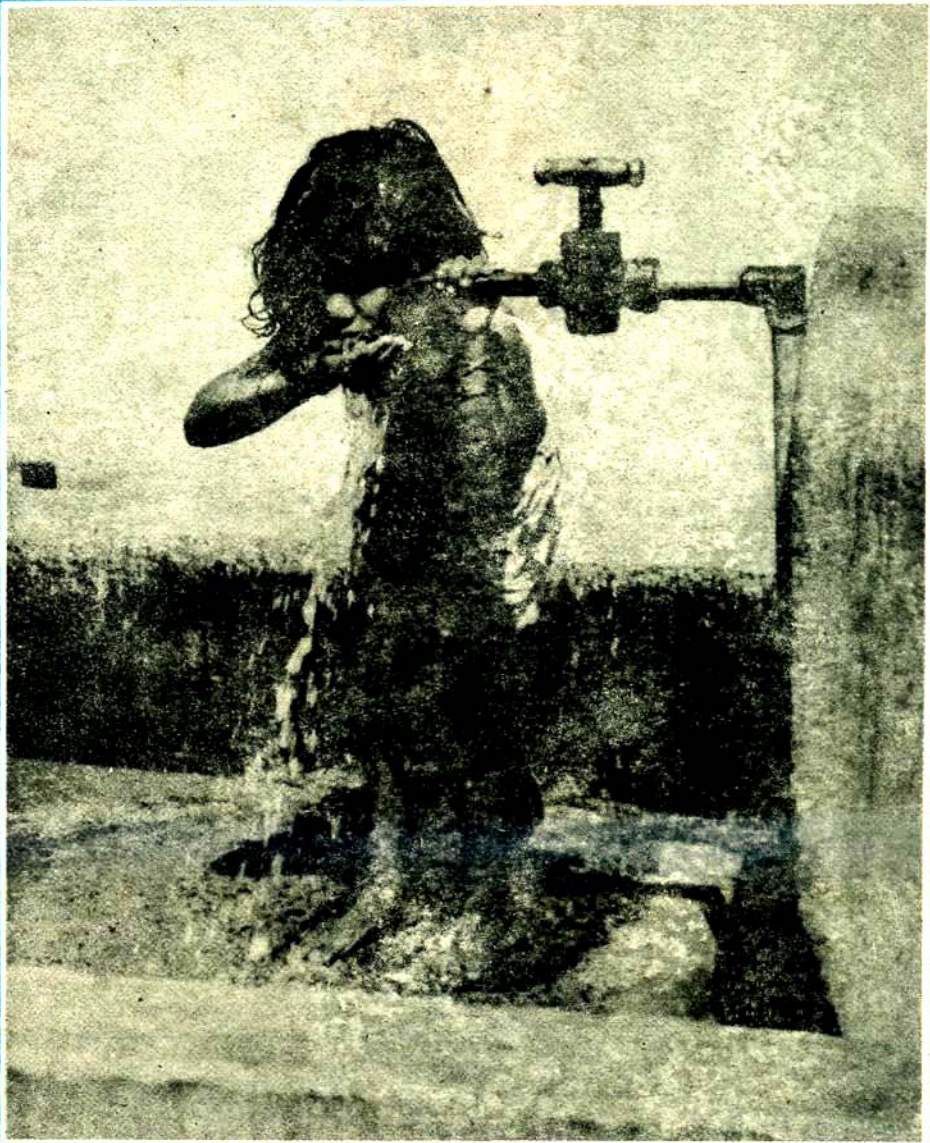
২৬, এইচ. এল. আর. রোড
দমদম, কলিকাতা-২৮

তিয়াষ মিটাতে জল

পুরস্কৃত
টীকা

ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২০ টাকা

★

* ফটো-নামকরণ ২০শে মে '৭৩-এর মধ্যে পৌঁছানো চাই।
* ফটোর নামকরণ দু চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো জুলাই '৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র — **হনুমান**

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র — **রাক্ষস**

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-26. Controlling Editor: CHAKRAPANI

সোয়ান কলম
দিয়ে সফলতার
শীর্ষে পৌঁছান
সোয়ান কলম দিয়ে লিখলে পরীক্ষায় সফলকাম হওয়া খুবই সহজ কেন না, আপনি অবাধে নিরন্তর লিখে যেতে পারেন। সোয়ান অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ কলমই ব্যবহার করুন—এগুলি ছাত্রদের সুবিধার জন্যই বিশেষভাবে তৈরী।
SWAN
সবচেয়ে ভালো ফলের জন্য চাই
সোয়ান
ডিলাক্স কালি
TRADE MARK
সোয়ান (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ
আদজানি চেম্বার্স, ফিরোজ শা মেহতা রোড, বোম্বাই—১
শাখা : ৩৪-বি কনট প্লেস নিউ দিল্লী—১
heros'-SI-119 Ben
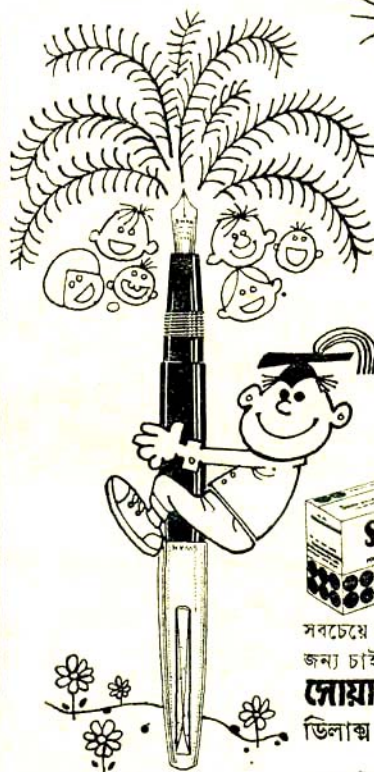
আমাদের
সবার ভাল লাগে
চাঁদমামা
তোমারও লাগবে
ছোট বড় সবাই চাঁদমামা ভালবাসে।
পত্রিকাটি বেরোয়—বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী,
গুজরাতী, তেলুগু, কন্নড, তামিল, মালয়ালম্
আর ইংরেজী মোট দশটি ভাষায়।
মন ভুলানো ছবি আর গল্পেতে ঠাসা।
চাঁদমামা ছোটদের মাসিক পত্রিকা—
কত ছোট হবে বড়, কত বড় হবে ছোট।
আজকেই চাঁদমামা কেনো।
গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ ডল্টন এজেন্সীস, চাঁদমামা বিল্ডিংস, মাদ্রাজ-২৬

CHANDAMAMA (Bengali) MAY 1973 Regd. No. M. 9100